মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

জুলাই ২০২৪
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১
যিলহজ্জ ১৪৪৫, মুহাররম ১৪৪৬
বর্ষ ৪৩ ॥ সংখ্যা ১০

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কোরআন ॥ আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলো না
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫
দারসুল হাদীস
ভালো কাজে ডান হাত ও ডান পায়ের ব্যবহার : আমাদের সংস্কৃতি
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক ॥ ১৫
চিন্তাধারা
ফিলিস্তিনে সংকট : সমাধান কোন পথে
ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী ॥ ২৩
মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ও ইসলাম
এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী ॥ ২৯
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে
সার্বজনীন ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের বাস্তব পদ্ধতি
প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ ॥ ৩৭
শিক্ষার্থীগণকে শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান না করা বিষয়ে আইন
শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া ॥ ৪১
ইসলামে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ
প্রফেসর ড. এবিএম মাহ্বুবুল ইসলাম ॥ ৪৭
আন্তর্জাতিক ॥ গাজার যুদ্ধের জের ॥ মীযানুল করীম ॥ ৫১
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৮

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :
সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম বা জামানত পাঠাতে হয়।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশের নাম	সাধারণ	রেজিঃ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মনি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা)-এর নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পেমেন্ট করুন -০১৭৩২৯৫৩৬৭০
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয়

ইসলামে ঈমান বা আকীদা-বিশ্বাস এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো মানুষের আকীদা-বিশ্বাস যেমন হয়, তার চিন্তা-চেতনা, 'আমল-আখলাক, আচার-আচরণ এবং অন্যান্য সবকিছু তেমনি হয়। এই আকীদা-বিশ্বাসই অন্তরালে থেকে মানুষের বাহ্যিক কাজ-কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাবই মানব জীবনে প্রতিফলিত হয়।

ঈমান বা আকীদা-বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি ছয়টি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

এ বিশ্বাসগুলো যারা দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন তাদের দুনিয়াবী জীবন হয় স্বচ্ছ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। আর যারা এ বিশ্বাসগুলো পোষণ করে না অথবা যাদের বিশ্বাস নড়বড়ে তাদের দুনিয়াবী জীবন স্বচ্ছ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় না।

আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছু দেখেন ও শুনেন। তার অবগতির বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। এ বিশ্বাস যিনি পোষণ করেন, তিনি কোনো অন্যায় কাজ করতে পারেন না। কারণ তা তো আল্লাহ দেখছেন আর তিনি ভালো-মন্দের বিচার করবেন। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় থেকে সংযত হতে বাধ্য করে। কারণ ফেরেশতাগণ মানুষের সকল কর্ম ও তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করেন। সুতরাং মানুষ যা-ই করুক ফেরেশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করেন। এই দলিল বা 'আমলনামার ভিত্তিতেই আখেরাতে তার বিচার হবে।

কিতাব ও রাসূলগণ মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দান করে। সুতরাং এ দু'টির প্রতি বিশ্বাস মানুষকে এগুলোর দিক-নির্দেশনার বাইরে চলতে বারণ করে। ফলে মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

মানুষের এই দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তখন তার সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব হবে এবং সেগুলোর আলোকে বিচার হবে। ভালো কাজের পাল্লা ভারী হলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর মন্দ কাজের পাল্লা ভারী হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। পুরস্কার হলো জান্নাত, আর শাস্তি হলো জাহান্নাম। সুতরাং আখিরাতের দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে এমন পথে পরিচালিত করে যাতে সে আখিরাতে পুরস্কার লাভ করতে পারে।

আর তাকদীরে বিশ্বাস মানুষকে বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করতে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে সত্য পথে অটল-অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই সে সত্য বিচ্যুত হতে পারে না। এ বিশ্বাসগুলোর অভাবেই মানুষ অন্যায় আচরণ ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। বর্তমান সমাজে অন্যায়, অপকর্ম ও দুর্নীতির যে মহোৎসব চলছে তা মূলত: এ বিশ্বাসগুলোর অভাবেই চলছে।

ইসলাম এ বিশ্বাসগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর আলোকে মানব জীবন গঠন ও পরিচালনকে বাধ্যতামূলক করেছে। এগুলো ধারন ও অনুশীলন মানুষকে উন্নত নৈতিক মানে উন্নীত করে। ফলে এ বিশ্বাসগুলোর প্রকৃত ধারক-বাহকগণ অনৈতিকতার পথ পরিহার করে নীতি-নৈতিকতার পথ অবলম্বন করেন। তার দ্বারা মানুষ ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় এবং কোনো অকল্যাণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে সমাজ সুন্দর, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এ বিশ্বাসগুলো মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। অন্যথায় সমাজে ক্রমান্বয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এক সময় তা পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে।

এ বিশ্বাসগুলোর আলোকে মানুষের জীবন গঠন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা, পারিবারিক পরিমণ্ডল প্রভৃতিতে এগুলোর শিক্ষা দান ও অনুশীলন করার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এগুলোর আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

মনে রাখতে হবে যে, ভালো মানুষ দ্বারাই ভালো সমাজ আশা করা যায়। সুতরাং সমাজকে ভালো করতে হলে ভালো মানুষ তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। আর এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। ■

নিয়মিত পড়ুন
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা
"মাসিক পৃথিবী"
অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।
০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলো না

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ}

অনুবাদ: 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর নি'য়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং এজন্যে যে, আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না', [আল 'ইমরান ৩: ১৬৯-১৭১]।

নামকরণ: সূরার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত 'আলে 'ইমরান' শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ 'ইমরান বংশধর।

নাযিলের সময়: সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী সূরা, [তাফসীরুল কুরতুবী ৪/১, তাফসীর ইবন কাসীর ২/৫]।

মূল আলোচ্য বিষয়: শারী'য়াতের মূলনীতিমালা; 'আকীদাহ, তাওহীদ, নাবুওয়াত, পরকাল, 'আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। ইসলামের কতিপয় আরকান ও ফারায়িয; হাজ্জ, জিহাদ, প্রকৃত মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলোর শানে নুযূল: এ আয়াতগুলো নাযিল প্রসঙ্গ বিভিন্ন রকমের বর্ণনা রয়েছে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাত হলে বলেন, 'জাবির! তোমার কি হয়েছে? তোমার মন খারাপ দেখছি? আমি বললাম, ওহুদের যুদ্ধে আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি তার পরিবার এবং অনেক ঋণ রেখে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাকে কি আমি

তোমার পিতার সাথে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সাক্ষাত করেছেন সে সুসংবাদ দেব? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সবার সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন। কিন্তু তোমার পিতাকে আল্লাহ জীবিত করে সরাসরি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, 'হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব'। তিনি বলেন, হে আমার রব! আমাকে জীবিত করে দিন যাতে আমি আবার আপনার পথে শহীদ হতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত এই যে, এরা দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে যাবে না'। জাবির বলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয়', [সুনানুত তিরমিযী, নং ৩০১০, সুনান ইবন মাজাহ, নং ১৯০, ২৮০০]।

কারো কারো মতে হামযাহ ইবন 'আব্দুল মোত্তালিব এবং মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) শাহাদত বরণ করেন এবং তারা যখন বিশাল মর্যাদা ও কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছেন তখন বলেন, হায় আফসোস! আমরা যে কি পরিমাণ নি'য়ামাত ও কল্যাণ লাভ করেছি তা যদি আমাদের রেখে আসা ভাইয়েরা জানতে পারত, তাহলে তারাও আগ্রহের সাথে বেশী বেশী জিহাদ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে এ সুসংবাদ পৌঁছে দেব। তখন আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতগুলো বিশেষ করে উহুদের শহীদগণের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। উপরের বর্ণনাটি এ উক্তি শুদ্ধ হওয়াকে সমর্থন করে। আবার কারো কারো অভিমত হচ্ছে, আয়াতগুলো বদরের শহীদগণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যাদের সংখ্যা ছিল মোট ১৪ জন।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যা : আলকুরআন ও সাহীহ হাদীসে আল্লাহর পথে ত্যাগ কুরবানীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমনকি মানবতার ইহকালীন সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও পরকালীন মুক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্থাৎ মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং লড়াই সংগ্রামের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অফুরন্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এমনকি যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে না করে জীবিত বলে সুউচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও তা তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ব্যক্তিদের মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন;

মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ...} 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত...'।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ}

‘আর আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না’, [আল বাকারাহ ২ : ১৫৪]। এসব আয়াতে আল্লাহর পথে নিহত শহীদগণকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা সর্বজন বিদিত যে, মৃত ব্যক্তিরা বারযাখ বা কবরের জগতে বিশেষ ধরনের হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের সুখ শান্তি ও আযাব ভোগ করে থাকে। দুনিয়াবাসীগণ তাদের জীবন সম্পর্কে টের পায় কি পায় না তা প্রথম আয়াতে স্পষ্ট হয়নি। তবে সূরা আলবাকারার আয়াতে এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ‘তোমরা তা অনুভব করতে পার না’; কেননা অনুভব করতে না পারাই প্রমাণ করে যে, দুনিয়াবসীগণ তাদের জীবিত থাকা মোটেও টের পায় না ও জানে না। [তাফীরুল কুরতুবী ১/২৭৩, আশ্‌শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান ১/২১৭, শাইখ আস্ সা‘দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ১২৪]। বস্তুতঃ যেসব মুসলিম আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য নিহত হয়, তাদেরকে শহীদ বলা হয়। আরো কিছু কারণে মারা গেলে তারাও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে মর্মে সাহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে। আল্লাহর দীনের জন্য শাহাদাত বরণ করা ইসলামের একটি বিশেষ উন্নত মর্যাদা। তাই ‘শহীদ’ পরিভাষাটি ইসলামের নিজস্ব মর্যাদাসম্পন্ন একটি বিশেষ পরিভাষা। এর সাথে মুসলিম ব্যক্তির নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে অনেক বড় ত্যাগ জড়িত রয়েছে। কিন্তু এ পরিভাষাটিকে আজ মানুষ; মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যার তার জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বারযাখের বা কবরের জীবন লাভ করে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু শহীদগণকে অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাদের জীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। যা বিভিন্ন সাহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন,

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا

‘শহীদগণের আত্মা সবুজ পাখিতে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাদের জন্য ‘আরশের সাথে ঝুলে থাকা কিছু ঝাড়বাতি রয়েছে। ফলে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তারপর তারা সেই ঝাড়বাতিগুলোর কাছে আসে। তখন তাদের রব

তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি কিছু চাও? তারা বলে হে রব! আমরা কি চাইতে পারি? আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি? আল্লাহ তাদের সাথে এভাবে তিনবার একই প্রশ্ন করেন। যখন তারা বুঝল যে, তাদের কিছু চাইতেই হবে, তখন তারা বলে, হে রব! আমরা চাই আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ফেরৎ পাঠান, যাতে আমরা পুনরায় আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি। যখন মহান রব দেখলেন যে, তাদের প্রয়োজন নেই তখন তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবেন', [সাহীহ মুসলিম ৩/১৫০২, নং ১৮৮৭]। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

'আল্লাহর কাছে যার জন্য কল্যাণ আছে, এমন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে দুনিয়াতে ফিরে আসা এবং দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব তার জন্যে অর্জিত হওয়া তাকে আনন্দিত করে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। কারণ শাহাদাতের মর্যাদা বাস্তবে শহীদ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করার কারণে পুনরায় নিহত হওয়ার অভিপ্রায়ে দুনিয়াতে ফিরে আসা তাকে আনন্দিত করে' [সাহীহ মুসলিম ৩/১৪৯৮, নং ১৮৭৭, মুসনাদ আহমাদ ১৯/২৯২, নং ১২২৭৩, ইবন কাসীর ২/১৬২]।

মহান আল্লাহ আরো বলেন যে, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল হাসান আল বাসরী বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও যুদ্ধে জীবনদানকারী শহীদগণ মহান রবের নিকটে জীবিত। তাদেরকে রিযক দেয়া হয়। ফলে তারা আরাম আয়েশ ও আনন্দ ভোগ করে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ}

'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরাত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম জীবিকা দান করবেন, আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি তো সর্বোত্তম রিযকদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে, আর আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, পরম সহনশীল', [আল হাজ্জ ২২: ৫৮-৫৯]।

ইবন আবি হাতিমের বরাত দিয়ে ইবন কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, সালমান আলফারিসী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْأَجْرِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ الرِّزْقَ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِيْنَ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ..}

'যে ব্যক্তি ইসলামী যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তার জন্য ঐ রকম (শাহাদাত বরণের) প্রতিদান দান করেন এবং তাকে রিযক দিয়ে ধন্য করেন এবং তাকে ফিতনাবাযদের থেকে নিরাপত্তা দান করেন। আর তোমরা চাইলে এ আয়াত {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ...} পাঠ করতে পার', [তাফসীর ইবন আবি হাতিম ৮/২৫০৩, তাফসীরুত তাবারী ১৮/৬৭৪, তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৪৪৮, আদওয়াউল বায়ান ৫/২৯২]।

শহীদদের মর্যাদার ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ}

'আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, তারাই সিদ্দীক আর শহীদগণ; তাদের জন্য তাদের রবের কাছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও নূর রয়েছে', [আল হাদীদ ৫৭ : ১৭]।

শহীদদের কর্মফল বিনষ্ট হবে না, আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ}

'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের 'আমলসমূহ বিনষ্ট হতে দেন না', [মুহাম্মাদ ৪৭: ৫ ৬]।

শহীদগণ ক্ষমা ও রাহমাত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}

'তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা তোমাদের মৃত্যু হলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তার চেয়ে উত্তম', [আল 'ইমরান ৩: ১৫৭]। অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিহত হোক বা মৃত্যু বরণ করুক, করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করা ও দয়া করার ওয়াদা করছেন এবং তাদেরকে অবহিত করছেন যে, আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করা বা শাহাদাত বরণ করা দুনিয়ার ভোগ বিলাসের সামগ্রী যতই সঞ্চয় করুক না কেন তার চেয়েও উত্তম। তাছাড়াও মৃত্যু যখন অবশ্যই বরণ করতে হবে, মৃত্যু থেকে পালানোর কোন পথ নেই; তাই আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করাই তো উত্তম' [তাফসীরুত তাবারী ৭/৩৩৭, তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৪৭, আদওয়াউল বায়ান ১/২১৫]।

হাদীসে নাবাবীতে শহীদের মর্যাদা, আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ

'শহীদ ছাড়া কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে পছন্দ করবে না, যদিও পৃথিবীর সবকিছু তার জন্য হয়। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি দুনিয়াতে ফিরে এসে দশ দশবার আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার আকাঙ্খা করবে; কেননা সে শহীদ হওয়ার বিশাল মর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছে', তা পাওয়ার জন্য এমনটি কামনা করবে, [সাহীহুল বুখারী ৪/২২, নং ২৮১৭, সাহীহ মুসলিম৩/১৪৯৮, নং ১৮৭৭]।

সামুরাহ ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالاَ: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

'আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, দু' জন ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে একটি গাছে আরোহণ করল। অতঃপর আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলে যে, সে ঘরটি খুব সুন্দর ও উত্তম। আমি এর চেয়ে সুন্দর আর কখনো দেখিনি। তারা দু'জন বলল, বস্তুতঃ এ ঘরটি হচ্ছে শহীদগণের ঘর', [সাহীহুল বুখারী ৪/১৬, নং ২৭৯১]। আল মিকদাম ইবন মা'দী কারিব আলকিন্দী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

'আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি বৈশিষ্ট রয়েছে; প্রথম বারেই তাকে ক্ষমা করা হয়, জান্নাতে সে তার আসন দেখে, কবরের 'আযাব থেকে মুক্তি দেয়া দেয়া হয়, বড় বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা পাবে, তার মাথায় ইয়াকূতের তৈরী সম্মানের তাজ পরানো হবে, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থ সবকিছুর চেয়ে উত্তম, বায়াত্তর জন হুরের সাথে তাকে বিয়ে দেয়া হবে এবং তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করা হবে', [মুসনাদ আহমাদ, সুনানুত তিরমিযী ৩/২৩৯, নং ১৬৬৩, সুনান ইবন মাজাহ, আত্তিরমিযী হাদীসটিকে সাহীহ গারীব বলেছেন। আলবানী এটিকে সাহীহ বলেছেন]।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

'ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়', [সাহীহ মুসলিম ৩/১৫০২, নং ১৮৮৬, মুসনাদ আহমাদ ১১/৬২৭, নং ৭০৫১]।

শাহাদাতের তামান্না, শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও বিশাল পুরস্কারের কারণে শাহাদাতের কামনা বাসনা মু'মিনদের জীবনের লক্ষ্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ এবং যুগে যুগে নিষ্ঠার সাথে তাদের

অনুসারীগণ শাহাদাতের আকাঙ্খা করতেন ও শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য মহান করুণাময় আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلاَثًا، أَشْهَدُ بِاللَّهِ

'ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি আকাঙ্খা করি যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি অতঃপর নিহত হই। তারপর আমাকে জীবিত করা হোক, অতঃপর আমি নিহত হই, তারপর আমাকে জীবিত করা হোক, অতঃপর আমি নিহত হই'। আবু হুরাইরা (রা) এ কথাগুলোকে 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তিনবার বলতেন, [সাহীহুল বুখারী ৯/৮২, নং ৭২২৭, সাহীহ মুসলিম ৩/১৪৯৫, নং ১৮৭৬]।

সাহ্‌ল ইবন হুনাইফ থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সত্যিকার ভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের মর্যাদায় পৌঁছে দেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যু বরণ করে', [সাহীহ মুসলিম ৩/১৫১৭, নং ১৯০৯, সুনান আবি দাউদ ২/৮৫, নং ১৫২০]। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, [সাহীহ মুসলিম ৩/১৫১৭, নং ১৯০৮]।

মহান আল্লাহ সুবহানাহুর পবিত্র বাণী, فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون 'আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না'। অর্থাৎ আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারীগণ তো আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত এবং তারা যে সুখ সম্ভোগ, আনন্দ উল্লাস ও অফুরন্ত নি'য়ামাতের মধ্যে রয়েছে তাতে তারা ভীষণ খুশি। তাছাড়াও দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শারীক তাদের পেছনে রেখে আসা সঙ্গী সাথী ও ভাইয়েরা, যারা তাদের পরে দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামে জীবন দিয়েছে ও আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তারা অচিরেই তাদের সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তাদের সামনের জীবনেও কোন ভয় নেই এবং তারা পেছনে যাদেরকে রেখে এসেছে তাদের ব্যাপারেও কোন চিন্তা নেই। তারা এ জন্যেও উল্লাস প্রকাশ করে যে, তাদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ভাইয়েরা জিহাদের অবিচল থেকে জীবন দিয়েছে। তারা তাদেরকেও নিজেরা মহান কৃপাময় আল্লাহর নিকট যে অকল্পনীয় আরাম আয়েশ ও সর্বোচ্চ প্রতিদান পেয়েছে, তাতে শারীক করবে, [তাফসীরুত তাবারী ৭/৩৯৫, ৩৯৭, তাফসীরুল বাগাভী ১/৫৩৮, তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৬৫]।

এ আয়াত প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাস্সির সা'ঈদ ইবন জুবাইর বলেন, শহীদগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং শহীদদের জন্য বরাদ্দকৃত সম্মান প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, হায় আফসোস! দুনিয়ায় অবস্থানরত আমাদের ভাইয়েরা যদি জানতো যে, আমরা কি পরিমাণ সম্মানের অধিকারী হয়েছি। তারা যদি নিজের জীবন নিয়ে সরাসরি জিহাদে উপস্থিত হয়ে শহীদ হয়ে যেত তাহলে আমরা যে কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছি তারাও অনুরূপ অর্জন করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সম্পর্কে এবং তারা যে সম্মানের মধ্যে রয়েছে তা অবহিত করেন। তাদের রব তাদেরকে অবহিত করেন যে, আমি তোমাদের নাবীর প্রতি ওহী নাযিল করেছি এবং তোমাদের বিষয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছি। সুতরাং তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বাণী, {وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ} উপর্যুক্ত আয়াত, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৬৫]।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ। 'তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর নি'য়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং এজন্যে যে, আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না', [আল 'ইমরান ৩: ১৬৯ ১৭১]। ইবন জারীর আত্ তাবারী এ অনুবাদটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, [তাফসীরুত তাবারী ৭/৩৯৫ ৩৯৬]। অর্থাৎ করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তিনি যে মু'মিনগণের কর্মফল নষ্ট করেন না এ দু'টি কারণে আনন্দিত। এ আয়াতের আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, 'তারা আল্লাহর নি'য়ামাত ও অনুগ্রহের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। আর নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না'। উভয় অর্থই সঠিক। দ্বিতীয় অর্থে তাদের আনন্দের কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহর নি'য়ামাত ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে। আর আয়াতের দ্বিতীয়াংশটি পৃথক বাক্য; যেখানে সকল মু'মিনগণকে শামিল করে বলা হয়েছে যে, মহান করুণাময় আল্লাহ শাহাদাত বরণকারী ও সাধারণ মু'মিনসহ কোন মু'মিনেরই কর্মফল নষ্ট করেন না বরং তাদের কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান ও পুরস্কার দেন। আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি হচ্ছে, যখনই তিনি কোন অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন, যে অনুগ্রহ দিয়ে তিনি নাবীদেরকে ধন্য করেছেন এবং তাদেরকে পর্যাপ্ত পুরস্কারের কথা বলেছেন তাদের পরপরই আল্লাহ তা'আলা ঐ অনুগ্রহের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা তিনি সকল মু'মিনদেরকে দান করেন, [তাফসীরুত তাবারী ৭/৩৯৮, তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৬৫]।

শিক্ষাসমূহ : আলোচ্য আয়াতগুলোতে মুসলিমদের জন্য শহীদগণের মর্যাদা ও তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার সম্পর্কে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হলো:

এক. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে শাহাদাত বরণকারীদের মর্যাদা ও পুরস্কারের মাত্রা কোন পর্যায়ের তা প্রত্যেক মু'মিন মুসলিমের গভীরভাবে অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।

দুই. শাহাদাতের আকাঙ্খা মু'মিন জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা, এই কামনা বাসনা লালন করা প্রতিটি মু'মিন পুরুষ ও নারীর উচিত।

তিন. নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

চার. আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসার ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কিরামের মত সময়, মেধা, শ্রম, সম্পদ ও জীবনের ত্যাগ ও কুরবানী পেশের জন্য মু'মিনদের সর্বদা নিঃশর্ত প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য।

পাঁচ. শহীদগণকে আল্লাহর নিকট জীবিত মনে করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। অপরদিকে শহীদ পরিভাষার গুরুত্ব অনুভব করে যত্রতত্র এই মহান মর্যাদাপূর্ণ পরিভাষা যেন ব্যবহৃত না হয়, সেজন্যে মুসলিমদের সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

মহান করুণাময় আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে এ শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে 'আমল করার তাওফীক দান করেন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বইগুলো নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে (বাংলা বাজার ও কাঁটাবন) পাইকারী ৩৭% এবং খুচরা ২৫% কমিশনে বিক্রয় করা হচ্ছে। ডাক ও কুরিয়ারযোগে দেশের যে কোনো জেলায় বই পাঠানো হয়।

বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, দোকান নং-১৫ (নীচতলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৪১-৬৭৭৩৯৯

কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

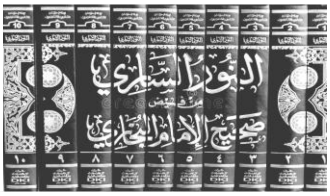

ভালো কাজে ডান হাত ও ডান পায়ের ব্যবহার : আমাদের সংস্কৃতি

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ –صلى الله عليه وسلم– كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

অনুবাদ ঃ সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে বলা হলো : "তোমাদের নবী (সা) তো তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-প্রস্রাব করার নিয়মও। তিনি বললেন, হাঁ। তিনি আরো বলেন, তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করতে, তিনটি পাথরের কম দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে এবং গোবর কিংবা হাড় দিয়ে শৌচকার্য করতে"।[১]

ব্যাখ্যা ঃ বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (সা) মানবজীবনের একান্ত জীবনঘনিষ্ঠ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা উপস্থাপন করে গেছেন। কিন্তু আত্মভোলা মানুষ হিসেবে আমরা কখনো সজ্ঞানে আবার কখনো অজ্ঞতাবশত তা যথাযথভাবে গুরুত্ব দেই না। বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা) আমাদেরকে পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে এবং অপর এক বর্ণনামতে কিবলা পেছনে রেখে বসতে নিষেধ করেছেন। এছাড়াও তিনি আমাদেরকে ডান হাত দ্বারা শৌচকার্য করতে, শৌচকার্যে তিনটি ঢেলার কম ব্যবহার করতে এবং গোবর ও হাড় জিনজাতির খাদ্য হওয়ায় তা শৌচকার্যে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তথাকথিত প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার দাবিদার একদল মুসলিম (?) উপরোক্ত নির্দেশনা গুরুত্বহীন মনে করে। তারা বিশেষত পানাহারে ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতের ব্যবহারকে অতি-আধুনিকতা মনে করে, যদিও তা আধুনিকতার নামে সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব ও হীনমন্যতার পরিচয়। আমরা এখানে 'ডান হাত ও ডান পায়ের ব্যবহার' বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাব : আল-ইসিতিতাবাহ, নং ৬২৯

কোন্ কাজ ডান হাতে এবং কোন্ কাজ বাম হাতে কিংবা কখন ডান পা আবার কখন বাম পা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় তা আমাদের জেনে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। কারো কাছে এই আলোচনা গুরুত্বহীন মনে হলেও আমরা মনে করি, 'একটি সুন্নাহ' সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা তা এক সময় অপসংস্কৃতির তীব্র স্রোতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। সৎকাজ ছোট হলেও তা তুচ্ছজ্ঞান করা নিষেধ। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে বলেছেন : "তুমি যৎসামান্য সৎকাজকেও তুচ্ছজ্ঞান করবে না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা"।[২]

এ ছাড়া নবী (সা)-এর সুন্নাহ প্রচলন করায় রয়েছে বিপুল সাওয়াব। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أجر مائَة شَهِيد.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমার উম্মাত বিগড়ে যাওয়ার সময় আমার সুন্নাত সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে একশ শহীদের সাওয়াব"।[৩]

আল-হাদীসে মানব-অঙ্গের ব্যবহার প্রসঙ্গ

ডান হাত ও ডান পা এবং বাম হাত ও বাম পায়ের ব্যবহার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো। হাদীসে ডান হাত ও ডান পা ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাপক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

(১) সকল ভালো কাজে ডান হাতের ব্যবহার

মহানবী (সা)-এর সাধারণ নিয়ম ছিলো এই যে, তিনি প্রতিটি ভালো কাজ ডান হাতে সম্পাদন করতেন এবং ডান দিক থেকে কাজের সূচনা করতেন। যেমন: খাওয়া, উযূ করা, মাথার চুল আঁচড়ানো, মসজিদে প্রবেশ, জুতা পরা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে শৌচকার্য করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, জুতা খোলা ইত্যাদি কাজ তিনি বাম হাত, বাম পা ও বাম দিক থেকে শুরু করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ.

---

২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব : ইসতিহবাবু তালাকাতিল ওয়াজহি ইনদাল লিকায়ি, নং ৬৮৫৭

৩. আল-মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ আল-ই'তিসামু বিল-কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ, খ.১, নং ১৭৬, পৃ. ৬২

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সকল কাজ-জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো ও পবিত্রতা অর্জন ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন”।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা)এর ডান হাত ছিলো পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য এবং তাঁর বাম হাত ছিলো শৌচকার্য ও ময়লা পরিষ্কার করার জন্য”।[৫]

(২) খাবার পরিবেশনে ডান দিকের অগ্রাধিকার

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِى هَذِهِ – قَالَ – فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وُجَاهَهُ وَأَعْرَابِىٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ. يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الأَعْرَابِىَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ. قَالَ أَنَسٌ فَهِىَ سُنَّةٌ فَهِىَ سُنَّةٌ فَهِىَ سُنَّةٌ.

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, “একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বাড়িতে এসে কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করলাম। অতঃপর আমি তা রাসূলুল্লাহ (সা)কে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তা থেকে পান করেন। আবূ বাক্‌র (রা) তাঁর বাম দিকে ছিলেন। ‘উমার (রা) ছিলেন তাঁর সামনে আর এক বেদুইন ছিলো তাঁর ডান দিকে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দুধ পান করা শেষ করেন, তখন ‘উমার (রা) আবূ বাক্‌র (রা) এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আবূ বাক্‌র, আপনি তাঁকে দিয়ে শুরু করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বেদুইনকে দিলেন, আবূ বাক্‌র ও ‘উমার (রা)কে দিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আগে ডান দিকের লোকদের, ডান দিকের লোকদের, ডান দিকের লোকদেরই অগ্রাধিকার রয়েছে। আনাস (রা) বলেন, এটিই সুন্নাত, এটিই সুন্নাত, এটিই সুন্নাত”।[৬]

(৩) ডান পায়ে জুতা পরা ও বাম পায়ে জুতা খোলা

---

৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাব : আত-তায়াম্মুনু ফিত-তুহুরি ওয়া গায়রিহি, নং ৬৪০

৫. আবূ দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাব : কারাহিয়াতু মাস্‌সসিয যাকারি বিল-ইয়ামীনি ফিল-ইসতিবরাঈ, নং ৩৩

৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, বাব : ইসতিহ্বাবু ইদারাতিল মায়ি ওয়াল লাবান..., নং ৫৪১১

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমাদের কেউ জুতা পরলে সে যেনো ডান দিক থেকে শুরু করে এবং যখন খোলে তখন যেনো বাম দিক থেকে শুরু করে। জুতা পরার সময় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা যেনো প্রথমে হয় এবং খোলার সময় যেনো শেষে হয়"।[৭]

(৪) নিদ্রায় যাওয়ার নিয়ম

মানবজীবনে খাওয়ার ন্যায় ঘুমেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং হাদীসেও ঘুমাতে যাওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ . فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ .

আল বারা'আ ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন : "তুমি বিছানায় যাবার সময় সালাতের উযুর ন্যায় উযু করবে। এরপর তুমি ডান কাতে ঘুমাবে, অতঃপর বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি আগ্রহ ও ভীতি সহকারে আমাকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার যাবতীয় বিষয় তোমার কাছে ন্যস্ত করলাম এবং আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তোমার নিকট আশ্রয়স্থল ছাড়া মুক্তির কোনো স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি এরপর যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর। এগুলো তোমার সর্বশেষ কথায় পরিণত করো"।[৮]

(৫) মাসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ, অতঃপর বাম পা দিয়ে বের হওয়া

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى.

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, এটা সুন্নাত যে, তুমি যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে আর যখন বের হবে, তখন বাম পা দিয়ে বের হবে।[৯]

---

৭. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাব: ইয়ানযিউ না'লাহুল ইউসরা, নং ৫৮৫৬
৮. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব : ফাদলু মান বাতা 'আলাল উযূ, নং ২৪৭
৯. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, আল-কাহেরা: দারুর রাইয়ান লিত-তুরাস, তা.বি. খ.১, পৃ. ৬২৩

(৬) দু'আ পড়ে রোগীর দেহে ডান হাতে ফুঁক দেওয়া

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। "নবী (সা) সূরা আন নাস ও সূরা আল ফালাক পড়ে তাঁর কোনো একজন স্ত্রীর ব্যথার স্থানে ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, 'হে আল্লাহ! মানবজাতির প্রতিপালক, ব্যথা দূর করে দাও। তাকে আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ভিন্ন আর কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করো, যা কোনো রোগ আর অবশিষ্ট রাখে না"।[১০]

(৭) মুসাল্লী একজন হলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে

حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِه .

শুরাহবীল (র) বর্ণনা করেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)কে বলতে শুনেছি : "রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিবের সালাত পড়ছিলেন। আমি তখন তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে এসে দাঁড় করান"।[১১]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কেবল একজন মুসাল্লী নিয়ে ইমামতি শুরু করে তাহলে মুসাল্লী ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে।

(৮) নেককার ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পাবে

عَنْ أَبِى ذَرٍّ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنِّى لأَعْرِفُ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَيْنِ الأُمَمِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ قَالَ « أَعْرِفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ».

আবূ যার ও আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "কিয়ামতের দিন লোকজনের মধ্য থেকে আমি আমার উম্মাত চিনতে পারবো। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উম্মাত কীভাবে চিনবেন? তিনি বলেন, আমি তাদের এভাবে চিনবো যে, তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, আমি এভাবে চিনবো যে, তাদের কপালে সিজদার চিহ্ন থাকবে এবং আমি তাদের এভাবেও চিনবো যে, তাদের সামনে দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হবে"।[১২]

---

১০. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত-তিব্ব, বাব : রুকইয়াতুন-নাবী স., নং ৫৭৪৩

১১. ইবন মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস-সালাত, বাব : আল-ইসনান জামা'আতুন, নং ১০২৬

১২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, তা.বি. নং ২২৩৭২

(৯) ন্যায়পরায়ণ শাসক মহান আল্লাহর ডানে স্থান পাবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণ আল্লাহর (আরশের) ডানে নূরের মিম্বরের নিকট অবস্থান করবেন এবং তাঁর দু‘হাতই হবে কল্যাণময়। তারা হলেন সেসব লোক যারা তাদের শাসনকার্যে, তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং সকল ব্যাপারে ন্যায়বিচার করেন”।[১৩]

(১০) লাশের গোসল শুরু হবে ডান দিক থেকে

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِى غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যার (যয়নব রা.) গোসলের ব্যাপারে বলেছেন, তোমরা তার ডানদিক থেকে এবং উযুর স্থানসমূহ থেকে (গোসল দেওয়া) শুরু করবে।[১৪]

(১১) ফেরেশতাগণ সারির ডান দিক থেকে মুসাল্লীদের দু‘আ করেন

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ ».

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ (মুসাল্লীদের প্রতি) রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা (সালাতের) কাতারের ডান দিক থেকে দু‘আ করেন।[১৫]

(১২) বাম হাতে খাওয়ার পরিণাম

حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِشِمَالِهِ فَقَالَ « كُلْ بِيَمِينِكَ ». قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ « لاَ اسْتَطَعْتَ ». مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

ইয়াস ইবন সালামা ইবনুল আকওয়া (র) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে বসে বাম হাতে আহার করছিলো। নাবী (সা) বলেন, ডান হাতে আহার করো। সে বললো, আমি তা করার সক্ষমতা রাখি না। বর্ণনাকারী বলেন,

---

১৩. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব : ফাদীলাতুল ইমামিল আদিলি ওয়া উকুবাতিল জায়ির..., নং ৪৮২৫

১৪. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব : আত-তায়াম্মুনু ফিল-উযূয়ি ওয়াল গুসল, নং ১৬৭

১৫. আবূ দাঊদ, কিতাবুস সালাত, বাব ; মা ইয়াসতাহিব্বু আইয়া লিআল ইমাম..., নং ৬৭৬

'আমি সক্ষমতা রাখি না' বলে বিরত থাকার মূলে ছিলো তার অহংকার। সে আরো বললো, অতঃপর সে তার ডান হাত ওপরের (মুখের) দিকে তুলতে পারেনি" (অর্থাৎ তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিলো)।[১৬]

(১৩) শয়তান বাম হাতে পানাহার করে

মহানবী (সা) ডান হাতে পানাহার করতেন এবং লোকজনকে নির্দেশ দিতেন। যেমন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেনো ডান হাতে আহার করে। আর যখন পান করে, সে যেনো ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে"।[১৭]

ইমাম নাওয়াবী (র) বলেন, সকল ভালো কাজে ডান হাত ব্যবহার অপরিহার্য। যেমন- উযূ, গোসল, তায়াম্মুম, কাপড় ও জুতা পরা, মোজা পরা, পায়জামা পরা, মিসওয়াক করা, চোখে সুরমা ব্যবহার, হাত-পায়ের নখ কাটা, গোঁফ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, মাথা মুণ্ডন করা, সালাতে সালাম ফেরানো, পানাহার করা, মুসাফাহা করা, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা, পায়খানা থেকে বের হওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে সব কাজে বাম হাত ও বাম দিক অনুসরণ কর্তব্য সেগুলো হচ্ছে, বাম দিকে থুথু ফেলা, পায়খানায় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা, বাম পা দিয়ে মাসজিদ থেকে বের হওয়া, জুতা, মোজা, জামা-কাপড় খোলা এবং শৌচকার্য সম্পন্ন করা ইত্যাদি।[১৮] অতঃপর তিনি দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ– قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ-

আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেনো কিছু পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। সে পায়খানায় প্রবেশ করলে যেনো ডান হাত দ্বারা তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে"।[১৯]

ইবন কুদামা বলেন, কারো হাতে যদি এমন কোনো আংটি থাকে যাতে আল্লাহর নাম খোদাই করা থাকে, তা খুলে রেখে যাওয়া উচিত।[২০]

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারি-

---

১৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, বাব ; আদাবুত তা'আমি ওয়াশ-শারাবি ওয়া আহ্কামিহিমা, নং ৫৩৮৭
১৭. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, নং ৫৩৮৪
১৮. আন-নাবাবী, আল-মাজমু, তা.বি. খ. ২, পৃ. ৯৩
১৯. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব; আন-নাহী 'আনিল ইসতিনজা বিল-ইয়ামীন, নং ১৫৩
২০. ইবন কুদামা, আশ-শারহুল কাবীর, তা.বি. খ. ১, পৃ. ৮৭

শিক্ষণীয়ঃ

(১) প্রতিটি ভালো কাজ ডান হাত দ্বারা ও ডান দিক থেকে শুরু করা মহানবী (সা)-এর সুন্নাত।

(২) মাসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

(৩) পানাহারে ডান হাতের ব্যবহার সুন্নাত।

(৪) বাম হাতে পানাহার করা শয়তানের কাজ।

(৫) ডান পায়ে জুতা পরা এবং বাম হাতে খোলা সুন্নাত।

(৬) সালাতে ইমামের ডানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

(৭) খাদ্য পরিবেশনের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা।

(৮) লাশের গোসলের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা।

(৯) পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা এবং বের হওয়ার সময় ডান পা ব্যবহার সুন্নাত। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন

ফিলিস্তিনে সংকট : সমাধান কোন পথে

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ইসরাইল বাহিনী ফিলিস্তিনে অবিরতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ইসরাইল নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে। তাদের হামলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আশ্রয় কেন্দ্র, বেসামরিক নিরীহ নাগরিকদের বাসস্থান কোন কিছুই বাদ পড়েনি। হামলায় এ পর্যন্ত (৮ জুন, ২০২৪) সাড়ে ১৫ হাজার শিশু সহ ৩৬,৭৩১ জন নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী নিহতদের ৬৯ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশ হচ্ছে নারী ও শিশু। এ হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে সমগ্র দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ হয়েছে। এমনকি এ হত্যাকাণ্ডের মদদদাতা আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রতিবাদ হয়েছে এবং হত্যাকাণ্ডের হোতা ইসরাইলেও প্রতিবাদ হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গও নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘ ও বিভিন্ন সময় নিন্দা জানিয়েছে এবং সম্প্রতি সংস্থাটি ইসরাইলকে অপরাধী দেশের কালো তালিকাভুক্ত করেছে। কিন্তু ইসরাইল এগুলোর কোন তোয়াক্কা করছে না বরং হত্যাযজ্ঞ চালিয়েই যাচ্ছে।

ফিলিস্তিন মুসলিম উম্মাহর একটি পবিত্র ভূমি। এটি বহু নবীর আবির্ভাবস্থল। পবিত্র বায়তুল মাকদিস এ ভূমিতেই অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদেরকে এনে এখানে বসতি স্থাপন করে দেওয়ায় এ দখলদার গোষ্ঠী এখন মুসলিমদেরকে উৎখাত করে গোটা ফিলিস্তিন ভূমি দখলের পায়তারা করছে এবং বিশ্বের কয়েকটি পরাশক্তি তাদের অন্যায় ও অনৈতিক এ কাজে মদদ দিচ্ছে।

দুঃখের বিষয় হলো ইসরাইল যেখানে ফিলিস্তিনে ইতিহাসের জঘন্যতম পৈচাশিক হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তখন মুসলিম বিশ্ব প্রায় নিশ্চুপ ও নির্বিকার। কিছু কিছু দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালেও এ অন্যায় হত্যাকাণ্ড বন্ধের কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে ইসরাইলের আগ্রাসী মনোভাব আরো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। হামাস তাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইসরাইলের সমরশক্তির তুলনায় তাদের সমরশক্তি একেবারেই তুচ্ছ হওয়ায়, তারা কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। তবে তারা জীবন বাজি রেখে সাধ্যমত প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ কোন সমাধান নয়:

বিশ্ব ফিলিস্তিনের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মৌখিক নিন্দা ও প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। অপরদিকে যারা ইসরাইলকে সমর্থন দিচ্ছে তারা অস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি সবকিছুসহ সার্বিক সহযোগিতা করছে। তার মোকাবেলায় শুধু মৌখিক সমর্থন, নিন্দা ও প্রতিবাদ কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না। যারা অপরাধী, অন্যায়প্রবণ, খুনি ও বর্বর তারা নিন্দাবাদকে কোন কেয়ার করে না। নেংটা কে নেংটা বললে তার শরম

পাওয়ার কি আছে? অনুরূপভাবে অপরাধীকে অপরাধী, বর্বরকে বর্বর বা আরো কোন নিকৃষ্ট অভিধায় অভিহিত করলে তাদের বিব্রত হওয়া বা লজ্জার কিছু নেই। কারণ তারা যা তাদেরকে তাই বলা হয়েছে। কথা দিয়ে অস্ত্রের মোকাবিলা হয় না, উপদেশ বা নিন্দা জানিয়ে যুদ্ধের মোকাবেলা করা যায় না। এজন্য যারা সন্ত্রাসী ও যুদ্ধবাজ তাদের মোকাবিলা অস্ত্র ও যুদ্ধ দিয়েই করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে সীমালংঘন করো না। কারণ আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (২ : সূরা আল বাকারা-১৯০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ কর। যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে।" (৯ : সূরা আত তওবা-৩৬)

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ ধরনের সন্ত্রাসী ও রক্তপাতকারীদের দমন করতে না পারলে দুনিয়া ফিতনা-ফাসাদের ভরে যাবে এবং ধর্মীয় উপাসনালয় গুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

"আল্লাহ যদি লোকদের একদল দ্বারা অন্য দলকে অবদমিত না করতেন, তাহলে দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যেত। তবে আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পশীল।" (২ : সূরা আল বাকারা-২৫১)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

"আল্লাহ যদি লোকদের কতককে দিয়ে কতককে অবদমিত না করতেন তাহলে মঠ, গির্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ- যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়, তা ধ্বংস হয়ে যেত।" (২২ : সূরা আল হাজ-৪০)

আল কুরআনে মুমিনদেরকে পরস্পর ভাই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ ভাই ভাই।" (৪৯ : সূরা আল হুজরাত-১০)

রাসূলুল্লাহ (সা) মুমিনদেরকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। হাদীছে এসেছে,

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى»

নু'মান ইবন বাশীর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দয়ামায়া, ভালবাসা ও

স্নেহপরায়ণতার ক্ষেত্রে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার গোটা দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে ভোগে।[১]

এজন্য কোন মুসলিম অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হলে অন্য মুসলিমদের তার সাহায্যে এগিয়ে আসা অত্যাবশ্যক। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম অঞ্চল বা দেশ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে শত্রুর মোকাবিলায় সে অঞ্চল বা দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসা আবশ্যক। যদি সে অঞ্চল বা দেশের মুসলিমরা শত্রুর মোকাবেলায় টিকে থাকতে অক্ষম হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা দেশের মুসলিমদেরকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামে প্রতিরক্ষা যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মুসলিমদের আবাসভূমি তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ। মুসলিমদের আবাসভূমি বা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যখন কোন শক্তি হামলা করে, তখন সে হামলা প্রতিহত করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্ঠিকভাবে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐ আক্রমণ থেকে ইসলাম ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কোন মুসলিমের অব্যহতি নেই। বরং তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমের উপর সালাত, সিয়ামের মতই ফরজে 'আইনে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থ বাদায়িউস্ সানায়ি'তে বলা হয়েছে,

"মুসলিমদের দেশের উপর শত্রুরা আক্রমণ করেছে, এ ঘোষণা যখন জারী করা হয়, তখন প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের উপর ব্যক্তিগতভাবে জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। সাধারণ ঘোষণা জারী হওয়ায় পর সকলে একত্রে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত এ ফরজ আদায় হয় না। এ সময় সালাত, সিয়ামের মতই প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজে 'আইন হয়ে যায়। সুতরাং দাস মুনিবের এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেরিয়ে পড়বে। কেননা সালাত, সিয়ামের মত যে সকল 'ইবাদত প্রতিটি মুসলিমের উপর ব্যক্তিগত ভাবে ফরজ, সেক্ষেত্রে দাসের উপর মনিবের এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর বৈধ কোন কর্তৃত্ব বা স্বত্ব নেই। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেরিয়ে পড়া বৈধ। কারণ ফরজে 'আইনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কোন কর্তৃত্ব চলে না, যেমন সালাত এবং সিয়ামের ক্ষেত্রে চলে না।"[২]

'জখিরা' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে 'নিহায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যখন জিহাদের ডাক আসবে, তখন যারা শত্রুর নিকটতম স্থানে অবস্থান করবে, তাদের উপর তা ফরজে 'আইন হবে। আর যারা শত্রু থেকে একটু দূরে অবস্থান করে, তাদের যদি প্রয়োজন না হয়, তাহলে সে জিহাদে তাদের অংশ গ্রহণ না করলেও চলবে। তবে নিকটবর্তী লোকেরা যদি শত্রুর মোকালিা করতে অক্ষম হয়, অথবা অলসতা ও

---

১. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু রাহমাতিন নাসি ওয়াল বাহাইম, হাদীছ নং ৬০১১।

২. 'আলাউদ্দীন আবু বাকর ইবন মাস'উদ আল্ কাসানী, বাদায়িউস সানায়ি' ফি তারতিবিশ্ শারায়ি' (কোয়েটা, পাকিস্তান: মাকতাবায়ে রাশিদিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.) খ. ৭, পৃ. ৯৮।

উদাসীনতার কারণে মোকাবিলা না করায় তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে পাশ্ববর্তীদের উপর জিহাদ সালাত, সিয়ামের মতই ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে যাবে। এ দায়িত্ব থেকে তারা কোনভাবেই অব্যাহতি পাবে না। এভাবে প্রত্যেক পরবর্তী বসতির উপর দায়িত্ব বর্তাতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের উপর তা ফরজ হয়ে যাবে।"[৩]

ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘকাল ব্যাপী ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। ইসরাইলের তুলনায় তাদের শক্তি কম হওয়ায় তারা অবৈধ দখলদারকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা সেভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও এগিয়ে আসছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে ফিলিস্তিনের সংকট আরো ঘনীভূত হবে। তাই ফিলিস্তিনের পাশে বিশ্ববাসীকে দাঁড়াতে হবে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোকে। এজন্য-

১. ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কসহ সকল ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।
২. তাদেরকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।
৩. মুসলিম দেশসমূহকে সামরিক জোট গঠন করতে হবে এবং সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। যাতে কোনো মুসলিম দেশ আক্রান্ত হলে সম্মিলিত সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে আগ্রাসন মোকাবেলা করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যাতে এর দ্বারা তোমরা আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতে পারো।" (৮ : সূরা আল আনফাল-৬০)

রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি পরাশক্তি বিভিন্ন দেশে তাদের মিত্রদের পক্ষে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে। আফগানিস্তান এবং ইরাক তার প্রকৃষ্ট নজির। ইসরাইলকেও আমেরিকা একইভাবে সহযোগিতা করছে। কিন্তু ফিলিস্তিন তার পক্ষে কিছু বক্তৃতা বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছে না। একটি মুসলিম দেশ আক্রান্ত হয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে আর মুসলিম উম্মাহ কেবল তা চেয়ে চেয়ে দেখছে, এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে? নিগৃহীত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়েও নির্বিকার থাকা কোনো আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতির জন্য শোভনীয় ও সম্মানজনক নয়।

---

৩. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্ জিহাদ, পৃ. ৬২। (শামী, খ. ৩, পৃ. ২৪০ এর উদ্ধৃতিতে)

সুতরাং ফিলিস্তিনের জনগণকে রক্ষার জন্য অস্ত্র, অর্থ এবং প্রয়োজনে সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। এটি মুসলিমদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহ এ দায়িত্ব কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না।

মজলুম মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করা অপরিহার্য

ইসলাম যে সকল কারণে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেয়, তার একটি হলো নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করা। যে সকল মুসলিম দুর্বলতা ও অক্ষমতা বা অন্য কোনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে শত্রুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়, সে সকল নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্ত করার দায়িত্ব স্বাধীন ও শক্তিশালী মুসলিমদের উপর বর্তায়। এজন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেই তাদেরকে মুক্ত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় এবং সে সকল দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির জন্য লড়াই করনা, যারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রভূ, আমাদেরকে এ জালিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বের করে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে বন্ধু ও সাহায্যকারী প্রেরণ কর?"(৪ : সূরা আন্ নিসা : ৭৫)

বিশেষ করে এ ধরনের মুসলিমরা যদি সাহায্যের আবেদন করে, তাহলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যক।

আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তা করা যাবে না। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখতে পান। যারা কাফির তারা একে অপরের সাহায্যকারী। তোমরা যদি তা না করো (মাজলুম মুসলিমদেরকে সাহায্য না কর) তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ গোলযোগ ও মারাত্মক অরাজকতা দেখা দেবে।" (৮ : সূরা আল্ আনফাল : ৭২-৭৩)

এ আয়ত দু'টি থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন জনবসতিতে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয়, অথবা তাদের উপর যদি নির্যাতন চালানো হয়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা মুসলিমদের উপর ফরজ। তবে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ

কোন জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তা করা যাবে না। কারণ চুক্তি রক্ষা করা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক।

আয়াতে কাফিরদেরকে একে অপরের সাহায্যকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পারস্পরিক মতবিরোধ এবং শত্রুতা সত্ত্বেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং তোমরাও যদি ধর্মীয় বন্ধনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পরের সাহায্যকারী না হও, তাহলে পৃথিবী ফিৎনা ফাসাদে ভরে যাবে। অর্থাৎ ইসলামের উপর কুফুরী ব্যবস্থার এবং হিদায়াতের উপর গোমরাহীর বিজয় ও পরাক্রম লাভ হবে, মুসলিমরা জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হবে, সততা ও ন্যায়-নীতি বিপর্যস্ত হবে। মুসলিমদের কোন দল বা জাতির স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং তাদের সত্য পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার হুমকি সৃষ্টি হবে। এ ফিৎনার মোকাবিলা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।[৪]

ফিলিস্তিনের জনগণ চরম জুলুমের শিকার। এ মাজলুমদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জালিম অথবা মাজলুম উভয় অবস্থায় তোমার ভাইকে সাহায্য কর। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মজলুম অবস্থায় তো আমি তাকে সাহায্য করব, কিন্তু যখন সে জালিম হবে, তখন তাকে কিভাবে সাহায্য করব? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখ অথবা বারণ কর, এটাই তাকে সাহায্য করা।"[৫]

সুতরাং ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। রুখতে হবে জালিম ইহুদীদেরকে। এজন্য অস্ত্র, অর্থ, সেনাদল- যা প্রয়োজন তা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সন্ত্রাসী, যুদ্ধবাজ এবং খুনীদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুকাবিলা করার কোনো উপায় নেই। এদেরকে অস্ত্র, যুদ্ধ এবং শক্তি দিয়েই মুকাবিলা করতে হবে। মুসলিম দেশগুলো এবং মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়টি বুঝতে দেরি করলে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের অস্তিত্বই সংকটে পড়বে। ■

---

৪. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্ জিহাদ, পৃ. ৮৪।
৫. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ্, বাবু ইয়মিনির রাজুলি লিসাহিবিহি আন্নাহু আখুহু, হাদীছ নং ৬৯৫২।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা ও ইসলাম

এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী

[২য় পর্ব]

ইসলামের ইতিহাস, মানবাধিকার রক্ষার অনবদ্য ইতিহাস। মানবাধিকার রক্ষায় ইসলামের আপোষহীণ ভূমিকা এক কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। রাসূল (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ মানবাধিকার সনদের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

□ **মানবাধিকারের ইসলামী দৃষ্টিকোণ:**

ইসলামে মানবাধিকার সংক্রান্ত পাঁচটি প্রধান ধারা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.জীবন রক্ষা, ২.সম্পদ রক্ষা, ৩.বংশ রক্ষা, ৪.জ্ঞান রক্ষা, ৫. ধর্মীয় বিশ্বাস সুরক্ষা।

মূলত: বিশ্ব মানবতার সুরক্ষা বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানবাধিকারের রূপরেখা পেশ করা এবং তার ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে ইসলামের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পৃথিবীর কোনো আইন ও সংবিধান, কোনো ধর্ম ও মতবাদ বা কোনো বিজ্ঞ-বিচক্ষণ, জ্ঞানী মানুষের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

১. ইসলামে সমগ্র জীবনটাই মানবাধিকারের আওতাভুক্ত:

ইসলাম মানবাধিকারের সীমাকে এতটা প্রশস্ত করেছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনটাই এর মধ্যে পড়ে। পিতামাতার হক থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধবের হক, শ্রমিক-মালিক এবং শাসক ও জনগণের হক, সরকারের হক, শ্রমজীবী মানুষদের হক, দুর্বল ও অসহায়দের হক, সাধারণ মুসলিমের হক, অমুসলিম ও সাধারণ মানুষের হক ইত্যাদি।

মানবাধিকারের কনসেপ্ট শুধু মানুষের জন্যই নয়, ইসলাম চতুস্পদ জন্তু ও অবলা প্রাণীর অধিকারও নিশ্চিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে বান্দার হক এবং আল্লাহর হক যথার্থরূপে আদায় করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

২. ইসলাম মানুষকে অধিকার আদায়ের চেয়ে অধিকার প্রদানের ব্যাপারে বেশি উৎসাহিত করেছে:

বর্তমান সমাজের বড় একটি দুর্বলতা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যতটা সোচ্চার, অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গাফেল বা উদাসিন থাকে। আর যে সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার আদায়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে থাকে গাফেল সে সমাজ বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার অভয়ারণ্যে পরিণত হতে বাধ্য। বর্তমান পৃথিবী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেহেতু, পরকালে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তাই ইসলাম প্রতিটি মানুষের মাঝে অন্যের হক ও অধিকার আদায়ের অনুভূতি জাগ্রত করে।

৩. সকলের হক আদায়ে পরস্পরকে সচেতন করে:

ইসলাম নারীদেরকে অধিকার আদায়ের জন্য কোন রকম উস্কানি না দিয়ে পারিবারিক শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে হকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দেয়ার জন্য মালিককে উৎসাহিত করে। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ বন্ধ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে প্ররোচিত করে না।

মোটকথা ইসলামে প্রতিটি মানুষকে তার উপর অন্যের যে হক রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী সঠিকভাবে আদায় করছে কি না সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। এভাবে ইসলাম পুরো দেশ ও পুরো সমাজকে শতভাগ অধিকার প্রদানকারী হিসেবে দেখতে চায়। বর্তমান সমাজের কমন চিত্র হচ্চে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমাজ যতটা সরব কিন্তু অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে থাকে সম্পূর্ণ নীরব।

সমাজের এ দৃশ্য ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বর্তমান সমাজে যে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা যাচ্ছে, তা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল।

৪. ইসলাম ব্যক্তির মনে দায়িত্ব পালনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে:

দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম শুধু আইনগত বাধ্যবাধকতাই আরোপ করে না; বরং মানুষের হৃদয় মনে এমন এক চেতনা জাগ্রত করে, যা ব্যক্তির মাঝে দায়িত্ব পালনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি সৃষ্টি হয়। ফলে শুধু আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা ও অসন্তুষ্টির ভয় এবং আখিরাতে জবাবদিহিতার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে নিজ থেকে সকলের হক সঠিকভাবে আদায়ে তৎপর হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে, দুনিয়াতে কেউ যদি অন্যের কোনো ক্ষতি করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি কাজের অণু-পরমাণুর হিসাব নেয়া হবে; কড়ায়-গন্ডায় তাকে সকলের হক আদায় করতে হবে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে। (৯৯ : সূরা যিলযাল, আয়াত : ৭-৮)

রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামগণ মানুষের অধিকার আদায়ে ছিলেন শতভাগ সচেতন। তাই তাঁদের যুগে শান্তি ও নিরাপত্তার যে দৃশ্য পৃথিবী দেখেছে মানবেতিহাসে এর নমুনা নজিরবিহীন।

৫. মানুষের উপর সৃষ্টিকূলের অধিকার:

সৃষ্টিকূলের মধ্যে নিকৃষ্ট জীব-জন্তুরও অধিকার ইসলামে গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃত। জন্তু-জানোয়ারের মাঝে যেগুলো মানুষের খাদ্য নয় সেগুলোও মানুষের কাছে দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী। কারণ সেগুলোও কোন না কোন ভাবে মানুষেরই কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- "প্রত্যেক তাজা অন্তরধারীর ক্ষেত্রেই কল্যাণের দিক রয়েছে।"

রাসূল করীম (সা.) বলেছেন- একটি মেয়েলোক একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাবার দেয়নি, পানিও খাওয়ায়নি আর ছেড়েও দেয়নি। ফলে বিড়ালটি মরে গেল। একটি জীবকে তা যতই নিকৃষ্ট হোক কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার অপরাধে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

অপরদিকে এক ব্যক্তি একটি পিপাসা কাতর কুকুরকে কূপ থেকে কষ্ট করে পানি উঠিয়ে পান করিয়েছিলেন বলে কুকুর প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। রাসূল করীম (সা.) বলেছেন- এ লোকটি এ কাজের জন্যই জান্নাতে যাবে। আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।

রাসূলে করিম (সা.) একটি লোককে গরুর পিঠে সওয়ার হতে দেখে বললেন- "গরু যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ও তার পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। তা সৃষ্টি হয়েছে চাষের কাজে (লাঙ্গল বা মই বা গাড়ী টানার) ব্যবহৃত হওয়ার জন্য।"

ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তা যবেহ্ করার ব্যাপারে বিশেষ দয়া প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমত তা যবেহ করা যাবে শুধু খাওয়ার জন্য। এছাড়া নিছক ক্রোধ, আক্রোশ বা মালিকের সাথে শত্রুতা করার উসিলায় হত্যা করা কঠিন গুনাহর কাজ বলে ঘোষিত হয়েছে।

□ ইসলাম প্রদত্ত বিভিন্ন মানবাধিকার:

মানুষের অধিকার হরণ করা ও তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা অনেক বড় জুলুম। জুলুমের কারণে বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। ইসলাম মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিধান আরোপ করেছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত হলো:

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality before law):

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান মর্যাদাসম্পন্ন। চাই সে পুরুষ কিংবা নারী হোক। পৃথিবীর সকল মানুষ ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন- "হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে করে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশী আল্লাহভীরু সেই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান।"

এ আয়াতে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো সমস্ত মানুষের জন্ম ও উৎস এক। সুতরাং বংশ, গোত্র ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার কোন সুযোগ নেই। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সর্বপ্রথম অনুচ্ছেদে একই কথা বলা হয়েছে- সকল মানুষের উচিৎ একে অন্যের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করা।

২. জীবনের মর্যাদা বা বেঁচে থাকার অধিকার (Rights of life and prestige):

ইসলামে মানুষের জীবনকে অত্যধিক মূল্য দেয়া হয়েছে। সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "একজন মানুষ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে তাহলে সে যেন গোটা মানবতাকে হত্যা করলো।" শরীয়তে শুধুমাত্র বিচারকদের রায়ের মাধ্যমে

কারো জীবন সংহার স্বীকৃত। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩ অনুচ্ছেদে ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তার বিধান আছে।

৩. ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার (Rights of personal freedom):

ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হলো অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা যাবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে ইসলামী বিধান হলো- আইনের সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া কাউকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার আটক বা বলপ্রয়োগ করা যাবে না। ইমাম মালিক লিখেছেন- In Islam no man may be imprisoned without justice। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বা দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে। এটি আধুনিক আইনের Principal of natural Justice অন্যতম উপাদান। পবিত্র কুরআনে সূরা বণী ইসরাইলের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না"। ইসলামের এ নীতির ফলে ইনসাফের এমন একটি ধারণা পাওয়া যায় যাকে আইনের আধুনিক পরিভাষায় নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগ পদক্ষেপ (Judicial Process of Law) বলা হয়।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

৪. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার (Rights of Economic Security):

সম্পদ ভোগের ব্যাপারে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে মহাল আল্লাহ বলেন- "হে বিশ্ববাসীগণ তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" UDHR-এর ১৭ অনুচ্ছেদে এ সম্পত্তি অর্জন ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম সম্পদ লাভের যেসব নিয়ম-নীতি ও পন্থা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা ভংগ করে কারো ব্যক্তিমালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোন ব্যক্তি বা সরকারের নেই।

৫. সংখ্যালঘুদের অধিকার (Rights of Minorities):

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান ইসলামে করা হয়েছে। সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- "তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য, আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।" (সূরা কাফিরুন : ৬)

সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই"। মুসলিমরা কখনো তাদের দেশের অমুসলিম নাগরিকদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে অথবা অত্যাচার করেছে ইসলামের ইতিহাসে এর সামান্যতম প্রমাণ পাওয়া যাবে না। যা UDHR এর ১৮ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে।

৬. গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা (Democratic Freedom):

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের এবং বক্তব্য প্রকাশের (Freedom of expression) স্বাধীনতা রয়েছে। তবে "আল্লাহ তায়ালা কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।" (৪ : ১৮৪)

এভাবে যুক্তিসঙ্গত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে বক্তব্য প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় ১৮ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ১৯ অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছে।

৭. জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার (Rights to benefit of secured life):

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের বেঁচে থাকার তথা জীবনের নিরাপত্তার অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম আদালতে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ও আদালত কর্তৃক শাস্তি ঘোষণা ব্যতীত কোনো মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করাকে সমস্ত মানবসমাজকে হত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করল অথবা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল, সে যেন সমস্ত মানবমণ্ডলীকে হত্যা করলো।'

৮. অমুসলিমের ধর্ম পালনের অধিকার (Rights of non-Muslims to practice their religion):

ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক স্বাধীন ও নিরাপদ বসবাস করার এবং নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক ধর্মের উপাস্যদের নিন্দা ও গালমন্দ করাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্যকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না।'

৯. নারীর মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার (Women's dignity and fair rights):

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করেছে। মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত ঘোষণা দিয়ে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। হাদিসে উল্লেখিত যে, জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নালোকে রাসূল (সা.) প্রথম তিনবার মায়ের সেবা করার কথা বলেছেন, অতঃপর চতুর্থ বারে পিতার সেবা করার কথা বলেছেন। আল কোরআনে নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ইসলাম প্রতিটা কন্যা সন্তানকে এক একটা জান্নাত বলে অভিহিত করেছে। ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তা বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল।

১০. ন্যায্য বিচার প্রাপ্তির অধিকার (Right to a fair trial):

ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের সুবিচার প্রাপ্তি এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার বিধান আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটবর্তী।' (আল-কুরআন)। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, পানি সেচ দেওয়া নিয়ে এক মুসলিম ও বিধর্মীর সাথে ঝগড়ার সৃষ্টি হলে রাসূল (সা.) সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ বিধর্মীর পক্ষে বিচারের রায় দেন। ফলে মুসলিম ব্যক্তিটি নাখোশ হয়ে উমার (রা.)-এর কাছে আপিল করলে উমার (রা) অপরাধী মুসলিম ব্যক্তির গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেন। এই বিচার ব্যবস্থা দ্বিতীয়টি আজো দেখা যায়নি।

১১. শ্রমিকের অধিকার (Worker's Rights):

ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার। শ্রমিক যেন তার প্রাপ্য অধিকার যথাযথ পায় এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) অত্যন্ত কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' এ ঘোষণা মালিক ও শ্রমিকের মাঝে কোনোরূপ বৈরতা সৃষ্টি হতে দেয়নি। রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন, শ্রমিকেরা তোমাদের ভাই, তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খেতে দিবে, তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে।

১২. মতামত প্রকাশের অধিকার (Right to express opinion):

নির্বিঘ্নে সত্য ও স্বাধীন মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্য গোপন করে মিথ্যা প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আল কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন- "লা তালবিসুল হাক্বা বিল বাতিল" অর্থাৎ "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করোনা এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলে ঘোষণা দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি সত্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নিহত হওয়াকে শহীদ বলে ঘোষিত হয়েছে।

১৩. দুস্থ-অসহায়ের অধিকার (Rights of the poor):

দুস্থ-অসহায় মানুষের জীবন মান সংরক্ষণের জন্য মহান আল্লাহ ধনীদের সম্পদে গরিবের হক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ইসলাম সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৪. সকল মানুষের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা (To Ensure human Rights for everyone):

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধন করাই এ জীবন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম মানবতার সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বদা সরব। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য হক আদায় করে দাও। এ ধরনের সার্বজনীন নির্দেশনা অন্য কোন ঘোষণায় দেখতে পাওয়া যায়না। ইসলাম পিতামাতা, ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলাম শ্রেণিগতভাবে মুসলিম ও অমুসলিমের উল্লেখ করে সকল শ্রেণি ও ধর্মের অধিকার দিয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসীদের মাঝে যে ভারসাম্য স্থাপন করেছে, প্রাচীন ও আধুনিক কোনো ইতিহাসই এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখাতে পারেনি।

উপর্যুক্ত মৌলিক অধিকারগুলো ছাড়াও ইসলাম ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের আরও যেসব সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অধিকারগুলো নিশ্চিত করার তাকিদ দিয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে-

- অক্ষম ও দুর্বলদের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
- মহিলাদের মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
- অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা লাভের অধিকার।

- ন্যায় আচরণ লাভের অধিকার।
- ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে অসহযোগিতার অধিকার।
- জালিমের অনুগত্য অস্বীকার করার অধিকার।
- রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অধিকার।
- ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার নিরাপত্তা লাভের অধিকার।
- জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার।
- সন্দেহের স্বীকার থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।

• বস্তুত: প্রায় পনের শত বছর পূর্বে মহানবী (সা.) বিদায় হজে মানবাধিকারের যে ঘোষণা দিয়ে গেছেন, বলা যায় আজকের মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR) তারই Reannounce ছাড়া আর কিছুই নয়। আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ইসলাম যেসব মানবাধিকার মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করেছে সেগুলো সার্বজনীন, শ্বাশত এবং চিরন্তন, যা সর্বাবস্থায় বন্ধু ও শত্রু সবাইকেই এ অধিকার দিতে বাধ্য থাকবে। এ সমস্ত অধিকারগুলোর ঘোষণা দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি বরং বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দু'টো পথও দেখিয়ে দিয়েছে।

১। রাষ্ট্রীয় আদালতে মামলা।

২। পরকালে অপরাধীর শাস্তি বিধান।

মানবাধিকার বাস্তবায়নে এ ধরনের চমৎকার ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য গবেষক ও লেখক Bosworth Smith তার Mohammed and Mohammandanism গ্রন্থে বলেন- "ইসলাম আগমনের সাথে সাথে পূর্বের সমাজে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অন্যায় ও অমানবিকতার মূলোৎপাটন যেমন হয়েছে তেমনি প্রতিটি মানুষের কুলষিত অন্তরকে ধুয়ে মুছে সাফ করে বিশুদ্ধতার ও মানবিকতার এক মহান আসনে আসীন করেছে।"

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই সকল যুগে সকল মানুষের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করেছে। অসীম জ্ঞানময় নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলামই মানবাধিকার নিশ্চয়তার একমাত্র গ্যারান্টি। আজকের বিশ্বে অধিকার বঞ্চিত নির্যাতিত মানবতার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলাম জীবন দর্শন হিসেবে যেমন পরিপূর্ণ, তেমনি মানবাধিকার ধারণাও ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রীয়ভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাইতো বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ বলেছেন- "আমরা বিশ্বাস করি, গোটা মানব জাতি আর অধিক কাল এ ধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আত্মরক্ষার মহা তাগিদেই মানুষ একে গ্রহণ করবে ইনশাআল্লাহ্।" (চলবে)

৩৬ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে সার্বজনীন ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের বাস্তব পদ্ধতি

প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মূলকথা হলো, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতিকে ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত রাখা।

সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মনে করে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কিছু আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মে মন্দির-প্যাগোডায় কিছু পূজা অর্চনা করলেই ধর্ম পালনের দায়িত্ব শেষ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে সব ধর্মের কোনো বিধি-বিধান বা নীতিমালা নেই।

ইসলামকেও তারা নিছক ধর্ম মনে করে ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে মসজিদে বা ঘরের সীমাবদ্ধতায় কিছু সালাত, সিয়াম, দান-দক্ষিণা করাকেই যথেষ্ট মনে করে ।

অথচ ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা রয়েছে। ইসলাম একটি ‘দীন’ বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। আল্লাহ তা‘আলা সূরা আলে ইমরানের ১৯নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, “নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ দীন বা জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম, যা আল্লাহর মনোনীত।”

ইসলাম শুধু কিছু ইবাদাত-উপাসনা, আচার-অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, কুটনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে।

ইসলাম একটি রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের নাম। ইসলামে মিথ্যাচার, ধোঁকা-প্রতারণা, সন্ত্রাস, গুম, হত্যা, নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ক, কালোবাজারি, মজুতদারি, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, নেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইসলামের সংবিধান আলকুরআন। ইসলাম নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ, মানবিক অধিকার সংরক্ষণের একটি সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা। যা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করে। যে রাষ্ট্র মানবতার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে গেছেন।

কোনো রাষ্ট্রে ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে নীতি-নৈতিকতাহীন মানুষদের কালোবাজারি, মজুতদারি, সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কাউকে হত্যা, অবৈধ যৌনাচার, স্বেচ্ছাচারিতা, নেশাগ্রস্ততা বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই তথাকথিত প্রগতিবাদী সেক্যুলারিস্টরা ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জিহাদকে ভয় পায়। ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে ন্যায়ের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

'জিহাদ' মানে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ নয়। জিহাদ মানে অন্যায়ের প্রতিরোধে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। আল্লাহ তা'আলা সূরা সফের ১০ ও ১১ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো না, যা তোমাদেরকে দুনিয়ার আযাব-গযব ও আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তা হলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।" সূরা আনফালের ৩৯নং আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "তোমরা সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতোক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা, অরাজকতা, দূরীভূত না হয় এবং সর্বস্তরে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত না হয়।"

সেক্যুলারবাদীরা ইসলামপন্থীদের জঙ্গিবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে কটাক্ষ করে। ইসলামের বিপ্লবী বাণীকে স্তব্ধ করার জন্য তারা ইসলামের মুখপাত্রদের মুখ বন্ধ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে ।

তাই আসুন, আমরা সত্যিকার মুসলিমরা দলমত নির্বিশেষে শীশাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব ধরনের অন্যায়-অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনায় নিবেদিত হই। তাহলে সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূরীভূত হবে। সব ধর্মের সর্বস্তরের মানুষ সার্বিক অধিকার নিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে।

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বজনীন শান্তিপূর্ণ ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠা করে সেক্যুলার ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অপকৌশল ও ভ্রান্তধারণার অপনোদন করা এখন সময়ের দাবি।

সেক্যুলারিজম নয়, কল্যাণধর্মী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদ্ধতি :

সাধারণ রাষ্ট্র গঠনের উপাদান :

একটি সাধারণ রাষ্ট্র গঠিত হয় সমসাময়িক সমাজের জনমানুষের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশ কেমন হবে, তা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ওপর। রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কোনো আদর্শকে চাপিয়ে দিলে সে রাষ্ট্রটি যেমন পদে পদে বাধার সম্মুখীন হবে, তেমনি তার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।

একটি সাধারণ রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন :

এক. ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোক্তাদেরকে উপর্যুক্ত সাধারণ রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলোকে ইসলামি আদর্শের সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

দুই. ইসলামি জীবনাদর্শ, তার নৈতিকতা ও চরিত্রের ভিত্তিতে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা।

তিন. সমাজের তুলনামূলক সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের এ আন্দোলনে শামিল করে যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানো এবং

তাদের মাধ্যমে জন-মানুষের চিন্তা ও চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

চার. ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যেখান থেকে তৈরি হবে মুসলিম দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তি বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে এমন বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে, যারা হবেন ইসলামি আদর্শের পূর্ণ অনুসারী। যারা যোগ্যতা ও দক্ষতায় হবেন অতুলনীয়। যারা সমাজের সর্বস্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেবেন।

পাঁচ. ইসলামি আদর্শের আলোকে প্রশিক্ষিত বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মীবাহিনীকে সাথে নিয়ে ইসলামি আদর্শিক আন্দোলনকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবেন। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচলিত অন্যায় ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এ ধরনের কর্মসূচির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে সব বাধা-বিপত্তি, বিপদ-মুসিবত, অত্যাচার, জেল-জুলুম আসবে, সেগুলো ধৈর্য ও কৌশলে মোকাবিলা করবেন। ত্যাগ ও কুরবানির নজরানা পেশ করবেন। প্রয়োজনে জীবন দিয়ে আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মজবুত ঈমানের পরিচয় দেবেন।

ছয়. ইসলামি আন্দোলনের নেতা, কর্মীদের আচার-আচরণ, চারিত্রিক মাধুর্য, সত্যবাদিতা,দেশপ্রেম, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থবাদিতা, নীতি-নৈতিকতা, আল্লাহভীরুতা ও সংকল্পের দৃঢ়তাসহ যাবতীয় মানবিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি আস্থাশীল হবে। তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, এ ধরনের দল বা মানুষদের হাতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হবে। ফলে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে যাদের চরিত্রে এখনও কিছু সততা ও ন্যায়নীতির প্রভাব বর্তমান রয়েছে, তারা দলে দলে এ আদর্শিক আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসবে। অপরপক্ষে নিকৃষ্ট ও চরিত্রহীন মানুষের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিলীন হতে থাকবে। মানুষের মনে সৃষ্টি হবে এক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। আর তখনই জনমানুষের মুখে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তীব্রতর হয়ে উঠবে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে একটি ইসলামি রাষ্ট্র জন্ম নেবে। এ রাষ্ট্র টিকে থাকবে বিপুল জনসমর্থন ও গণভিত্তির ওপর। এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে সারা পৃথিবীর সাথে কঠিন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার বড় শক্তি হবে ব্যাপক গণসচেতনতা ও ব্যাপক গণভিত্তি।

সাত. প্রচলিত ভুল ধারণা :

আমাদের অনেকের মাঝে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, দেশের সকল মুসলিম এক হয়ে গেলেই বাংলাদেশকে আমরা ইসলামি রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলতে পারবো। আবার অনেকে এ কথা প্রচার করছেন যে, দেশের সব আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও

ইসলামি দলগুলো এক প্লাটফর্মে এবং একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেই ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে যাবে। আবার এক শ্রেণির মানুষ স্বপ্ন দেখেন যে, হঠাৎ করে কোনো একদিন ইসলামপ্রিয় জেনারেল বন্দুকের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জাতিকে ইসলামি রাষ্ট্র উপহার দেবেন। কেউবা সশস্ত্র গোপন আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে এর কোনোটিই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঠিক ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি নয়। একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি বা মুসলিমদের কোনো গ্রুপ বা দল যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হলেই সেটি ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে যায় না। তাদের শতভাগ আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলেও তাদের পক্ষে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেদিন তা উপরিউক্ত পদ্ধতিতে গঠিত না হয়। এর বাস্তব প্রমাণ নিকট অতীতেই অনেক রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, সশস্ত্র বিপ্লব বা কোনো ইস্যুভিত্তিক বিপ্লব নয়, জনমতের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আদর্শিক বিপ্লবের মাধ্যমে সেক্যুলারিজমের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে সার্বজনীন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। ■

লেখক : অধ্যাপক, গবেষক, কবি ও গীতিকার ।

নতুন প্রকাশিত হলো-

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www. dhakabic.com,

E-mail : dhakabic@gmail.com

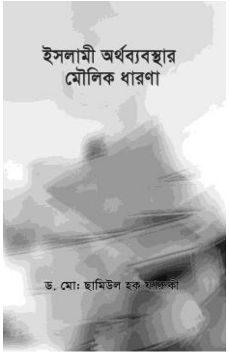

শিক্ষার্থীগণকে শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান না করা বিষয়ে আইন

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

আমরা হরহামেশা বলি, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। আমরা আরও বলি, 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এ কথাগুলো শুধু আমরা মুখেই বলি না, ধারণ ও লালন করি এবং এটিই বাঞ্ছিত ও শ্বাশত। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও 'মানুষ গড়ার কারিগর' বলে কথিত মান্যবর শিক্ষক সমাজের কিয়দংশের শিক্ষার্থীগণের সাথে কিছু ব্যবহার দুঃখজনক। বিশেষতঃ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে এক শ্রেণীর শিক্ষকের ব্যবহারিক আচরণ নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য ও অনভিপ্রেত। শিক্ষা দান, পাঠদান ও শাসনের নামে তাঁরা সন্তানতুল্য শিশু কিশোরদেরকে সহপাঠীদের সামনে এমনভাবে শারীরিক ও মানসিক পীড়ন ও বকাঝকা করেন যা রীতিমত অকল্পনীয়। সজোরে থাপ্পড় মেরে কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়া, বেত্রাঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা, জখম ও রক্তাক্ত করা, শিকল দিয়ে বেধে রাখা, অশ্রাব্য গালি-গালাজ করা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা কেবল ফৌজদারী অপরাধ ও পেশাদারিত্বের অবমাননাই করেন না, তাঁরা শিক্ষার্থীর মন ও মননকে ক্ষতিগ্রস্থ করেন, জাতির বিনাশ সাধন করেন। অযাচিত শাসন ও বেসামাল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর কাছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক হয়ে উঠেন এক মূর্তমান আতঙ্ক, অনেকটাই 'সাক্ষাত আজরাইল'। শিক্ষা তখন হয়ে পড়ে বিষময় এবং পর্যায়ক্রমে অনেকের নিকট বিদ্যালয় হয়ে পড়ে এক মিনি কারাগার।

<u>শারীরিক শাস্তি প্রদান বিষয়ে আমাদের সংবিধান ঃ</u> শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের নামে যে সব শাস্তি দেওয়া হয় তা আমাদের সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছেঃ

অনুচ্ছেদ ২৭ ঃ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ৩১ ঃ আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত : আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

অনুচ্ছেদ ৩২ ঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৫(৫) ঃ কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা

লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী, ৯ বছর পর্যন্ত কোন শিশুকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৩ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে জনস্বার্থে দায়ের করা একটি রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল এবং মাদ্রাসায় সব ধরনের শারীরিক শাস্তি অসাংবিধানিক ও মানবাধিকারের লংঘন ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন।

এ রায়ে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক দ্বারা কোন রকম শারীরিক শাস্তি অথবা নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ শিশু শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লংঘন।

হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে কেন অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না-মর্মে রুল জারি করেন। সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কেন নির্দেশনা প্রদান করা হবে না, সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশনাগুলো হলো-

১. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণ এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
২. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে প্রেরণ;
৩. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন যে অপরাধ, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং বেতারের তথ্য প্রচার করা;
৪. শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

রায়ে আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহও প্রদান করেছেন :

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা তৈরি করে তার সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) রুলস ১৯৮৫ তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির বিষয়টি ‘অসদাচরণ’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করা, আটকে রাখা, প্রহার করা, চুল কেটে দেওয়া, শিকল দিয়ে আটকে রাখাসহ এ ধরনের শাস্তি অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। স্কুল ও মাদ্রাসা পরিদর্শনের মধ্যে সব প্রকার শারীরিক শাস্তি, এ সংক্রান্ত

অভিযোগ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি ভিকটিমের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।

৪। এ ধরনের তদন্তের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং ভিকটিমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। এসব নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে পালন হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি জাতীয় কমিশন বা কমিটি গঠন করতে হবে।

৬। জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।

৭। জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রতি ছয় মাস পর পর সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আদালতে পেশ করবে।

৮। সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে কি না এবং কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা তদারকির জন্য একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দিতে হবে।

এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মাদ্রাসাসহ সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে প্রশাসনিক আদেশ জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৬ই আগস্ট ২০১০ইং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডকে ইতিমধ্যে স্কুলগুলোতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনসহ কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানিয়ে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলে। তাছাড়া অবিলম্বে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) সার্কুলারের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথাও বলা হয়।

এছাড়া, শারীরিক শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত শিক্ষকদের কোন কোন বিধিমালা ও আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যাবে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।

উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২১ এপ্রিল ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১' জারি করে। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। নীতিমসালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালা পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালা অনুযায়ী -

শারীরিক শাস্তি ঃ শারীরিক শাস্তি বলতে ছাত্রছাত্রীকে কোন ধরনের দৈহিক আঘাত করাকে বোঝাবে। এর আওতায় শিক্ষকরা কোন ছাত্রছাত্রীকে-

১. হাত-পা বা কোন কিছু দিয়ে আঘাত করতে পারবেন না;
২. তাদের দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় বস্তু ছুঁড়ে মারা যাবে না;
৩. ছাত্রছাত্রীদের শরীওে আঁচড় বা চিমটি কাটা যাবে না;
৪. এমনকি তাদের শরীরের কোন স্থানে কামড়ও দেওয়া যাবে না;
৫. শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের চুল ধরে টানতে বা কাটতে পারবে না;
৬. ছাতছাত্রীদের হাতের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল চাপা দিয়ে মোচড় দিতে পারবেন না;
৭. ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে উঠবস করানো বা ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়া যাবে না;
৮. চেয়ার-টেবিল বা কোন কিছুর নিচে ছাত্রছাত্রীদের মাথা ঢুকিয়ে রাখা, হাঁটু গেড়ে দাঁড় করানো, রোদে দাঁড় করিয়ে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না এবং
৯. ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যাবে না, যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ রয়েছে।

মানসিক শাস্তি ঃ শুধু শারীরিক শাস্তি নয়, শিক্ষার্থীদের কোনরূপ মানসিক শাস্তিও দেওয়া যাবে না বলে নীতিমালায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে কোন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা যাবে না। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবা, বংশ পরিচয়, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষকরা অশালীন মন্তব্য করতে পারবেন না। একই সঙ্গে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা এমন কোন আচরণ করবে না, যা তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

শারীরিক শাস্তির ক্ষতিকর দিক ঃ শারীরিক শাস্তির মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। শারীরিক শাস্তি শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়। এটি শিশুকে স্কুলের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা স্কুলও ছেড়ে দেয় যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষকদের শাস্তি ঃ নীতিমালা অনুযায়ী কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি এসব অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা **১৯৭৯** সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে **১৯৮৫** সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যাদের ক্ষেত্রে এ দু'টি আইন প্রযোজ্য হবে না, তাদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

নীতিমালার আওতায় ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার কাজ চালাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র ও নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও শারীরিক শাস্তির কুফল সম্পর্কে জানাবেন। পরিচালনা পর্ষদ শাস্তি বন্ধের পদক্ষেপ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে। এতে পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষা প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন। অহেতুক অভিযোগ এড়াতে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অবিভাবকদের সচেতন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নীতিমালায়। এ ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধের বিষয়ে শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

ভুলে গেলে ভুল হবে যে, প্রতিটি শিশু কিশোরেরই নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা আছে, আছে ভাবাবেগ, আছে আত্মসম্মানবোধ। সে ভালোবাসা চায়, আদর চায়, মমতা চায়। অপমান চায় না, চায় না নিগ্রহ-নির্যাতন। বয়:সন্ধিক্ষণে তার ভেতরে কৌতুহল জাগে, প্রেম ও প্রেরণা জাগে, স্বপ্ন ও প্রশ্ন জাগে, সে জিজ্ঞাসা করে এবং প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসিত হয়- এ দুয়ের অনুপম সেতুবন্ধন তাকে শেখায়, নিরন্তর শেখায়। জীবনমুখী করে, করে উজ্জীবিত।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রুপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল, পরাজিতকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়-মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দন্ড ও চরম দন্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

"রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। 'শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা'। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।" (শিক্ষা)

পরিশেষে বলবো, শিশু কিশোরেরা স্বভাবগত ভাবেই হয়ে থাকে চপল, দুরন্ত ও ডানপিটে। যে শিশুর ভেতরে দুরন্তপনা নেই, যে শিশু লাফ দিতে পারে না, ঝাঁপ দিতে জানে না, দুষ্টুমি-খুঁনসুটি-কলরব-কোলাহলে মেতে থাকে না বা পরিবেশ মাতিয়ে রাখতে পারে না সেই শিশুকে মূক, মূঢ় বা প্রতিবন্ধী বলা না হলেও তাকে স্বাভাবিক শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যাধিকারী বলা যায় না। শিশুরা প্রকৃতি থেকে শেখে, খেলতে খেলতে শেখে, আমোদে-আহ্লাদে শেখে। এভাবেই তাদের শিক্ষা ও শিক্ষাগ্রহণ হয় নির্মল, সহজাত ও সৃজনশীল যা তার পরবর্তী জীবনকে করে তুলবে বাঙ্ময়।

এখানে একথা বলা হচ্ছে না যে, শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে শাসন করতে পারবেন না। শাসন-বারণকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, শাসন যেন অত্যাচার-উৎপীড়ন এর প্রতিশব্দ হয়ে না উঠে। শাসন ও সোহাগ এর মাঝে ভারসাম্য থাকতে হবে। এ ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা প্রতিটি শিক্ষকের থাকা চাই।

সর্বোপরি, শিক্ষক হবেন বন্ধু, পরম বন্ধু। শিক্ষক হবেন দায়িত্বশীল অভিভাবক। শিক্ষক হবেন নির্ভরতার প্রতীক, নির্ভরতার মহিমময় আধার। আর তখনই শিক্ষার্থী শিক্ষার মাঝে সীমাহীন আনন্দ খুঁজে পাবে এবং বিদ্যালয় তার কাছে হয়ে উঠবে এক প্রিয় ও আরাধ্য তীর্থস্থান। ■

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

(সারা দেশে কুরিয়ার ও ডাকযোগে বই পাঠানো হয়)

০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

ইসলামে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

প্রফেসর ড. এবিএম মাহ্বুবুল ইসলাম

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী যে সংস্কৃতি চলমান, যে সংস্কৃতি মুসলিমের ঈমান-আকীদা, বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সাংঘর্ষিক তথাকথিত এ সংস্কৃতি ইসলামী সমাজের সৃষ্ট নয় বরং এটি মুসলিম-অমুসলিম দেশ ও সমাজের উদীয়মান সেক্যুলার দর্শনের ফসল। যার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সংস্কৃতিকে বিদায় জানানো এবং হচ্ছেও তাই। মুসলিম দেশে ইসলামী নেতৃত্বের স্থলে সেক্যুলার নেতৃত্বের অবস্থান এবং বিশ্ব রাজনীতি থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের ভূমিকা অবসানের প্রেক্ষিতেই সেক্যুলার সংস্কৃতি এর স্থান দখল করে নিয়েছে। ১০০০ বছরের বেশি সময় মুসলিমরাই ছিল বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে। এর মধ্যে বাংলায় ছিল প্রায় ৫০০ বছরের শাসন। সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিমদের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে ভারতের মোগল মুসলিম শাসকদের হেরেমে (ব্যক্তিগত শয়ন কক্ষ) ধূর্ততার সাথে পৌত্তলিক পূজারীরা তাদের রমনীদের পর্যন্ত অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। দুরন্ত প্রতাপশালী মুসলিম শাসকেরা শুধু ক্ষমতাই হারায়নি বরং হারিয়েছে নীতি-নৈতিকতা এমনকি স্থানবিশেষে হারিয়েছে ঈমানও।

সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ শুধু এখানকার মুসলিমদের জন্যই ক্ষতিকর নয় বরং তা বিশ্ববাসীর জন্য অতীতের চেয়েও ভয়ানক রূপে খারাপ। কারণ এই সংস্কৃতির ধারকেরা দেব-দেবীর পূজারী।

আর এই উপমহাদেশে মূলত: তা শুরু হয়েছে সম্রাট আকবরের হাত ধরে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন ১০০০ বছর ধরে যে শত্রুরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল তারাই প্রকাশ্য ও গোপনে সম্রাট আকবরের পক্ষ থেকে সমর্থন ও উৎসাহ পেয়েছিল। শুধু তাই নয় আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লি ও আগ্রায় রাজপ্রাসাদে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনা চালু হয়।[১] ইসলামী আইনকে তোয়াক্কা না করে তিনি জয়পুরের রামা বিহারী মৌলের কন্যাকে হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণে বিয়ে করেন। রাজপ্রাসাদে তার জন্য দেব-দেবীর পূজার ব্যবস্থা করে দেন। ওই সময়ে মুসলিম রীতির উপাসনা রাজপ্রাসাদে অনুমোদনই ছিল না। বিপরীত পক্ষে মূর্তিপূজা ও আগুন পূজা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আকবর তার গলদেশে জপমালা পরে হিন্দু তপস্বীর (দেবতার) মত রাজপ্রাসাদে বসতেন। এই মূর্তিপূজক সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ তাকে স্ব-ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে দ্বীনে ইলাহী বা

1. The Catas trope period of India, 2004. Cultural conference. National cultural council, p. 33.

ঈশ্বরের ধর্ম চালু করতে উদ্বুদ্ধ করে। তা ছিল বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত একটি মানবসৃষ্ট নতুন ধর্ম। এ ধর্মমতের বিশ্বাসী হিসেবে আকবরের সূর্য উপাসনা থেকে সকল ধর্মের পূজারীরাই ছিলেন।[২] আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার উত্তরাধিকারীরাও। বলা হয়ে থাকে আকবর এবং জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মুসলিম রীতির সালামের পরিবর্তে হিন্দুরীতি অনুসারে মাথা নত করতে বাধ্য করা হতো। মুসলিম জনগণ মসজিদের পরিবর্তে মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে কোন কোন স্থানে। ফলে মেরামতের অভাবে মসজিদগুলো ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।[৩] ইসলামের শিল্প ও স্থাপত্যের স্থলে হিন্দু স্থাপত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। মুসলিমের রাজধানী দিল্লির সংস্কৃতি বিকৃত মুসলিম শাসন আমলে চলতে থাকে কয়েক শত বছর ধরে। এ দুর দিন যা আর উদ্ধার হয়ে আসেনি। ১৮৫৭ সালে দিল্লি খ্রিস্টান শাসিত ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায় সংস্কৃতির আগ্রাসনের বেড়াজালে পড়ে। এদিকে বাংলার অবস্থাও ছিল অনুরূপ। এখানকার এক শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যাকে দ্বিতীয় আকবর হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। রাজধানী সোনারগাঁ ছিল এ শাসকের শাসনকাল যা ছিল ১৫৩৩ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত।[৪] তিনি ইসলাম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তার কুটকৌশলে সমগ্র মুসলিম বাংলা বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে সত্যনারায়ণ নামক একজন সাধককে সত্য পীর বা সাধক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং মুসলিমসহ সকল শ্রেণীর লোকজন তাকে পূজা করতে শুরু করেছিল।[৫]

এদিকে মুসলিম রাজধানী দিল্লির লালকেল্লায় হিন্দু রমণীদের রাজ রানীর মর্যাদায় আসীন হওয়ার সুবাদে রাজপুত ও রাজকুমার ও রাজকুমারীরা দীপা ওয়ালী এবং কালী পূজায় আসক্ত হয়ে পড়ে। যেমন আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর তার পিতা আকবরের কবরে হিন্দুয়ানী পদ্ধতিতে শ্রাদ্ধ করেছিলেন। এদিকে বাংলায় আলীবর্দী খানের ভাগ্নে মতিঝিলের প্রাসাদে হোলি পূজা করতেন এবং ওই সময়কার বাংলার নবাব মীর জাফর আলী খান ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন তার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে। এও জানা গেছে যে মৃত্যুর সময় মীর জাফর আলী হরিশপুরী দেবীর পা ধোয়া পানি পান করেছিলেন।[৬] এআর মল্লিক আরো লিখেছেন যে ওই সময়ে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদের ইসলাম পালনের কোন সুযোগ ছিল না। বিধায় তার পরিবর্তে তারা হিন্দুদের

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
3. History of nationalism, information gusted from the most Catas trophe period of India. P. 42
4. Akram Khan, Social history of Muslim Bengol. Quoted by Abbas Ali Khan in the Religious & Cultural Destinction of muslim, p. 42
5. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
6. A R Mollik, British Policy in muslim Bengol. P.44

দুর্গাপূজার আদলে তাজিয়া বানিয়ে মহররমের আশুরা পালন করতে শুরু করে, আতশবাজি ফুটায়ে শবে বরাত পালন করতে থাকে। আর এসবই ছিল হিন্দুদের উৎসব জগন্নাথ বা রথ টানা পূজার আলোকে এবং হিন্দুদের গুরু চান আদলে ব্রাহ্মণদের নিকট মাথা নত করার মত পীরদের কাছে মাথা নত করার পদ্ধতি রপ্ত করে যা আজও চলমান। বাংলার নবাব সিরাজের প্রেক্ষাপট ও হিন্দু এবং ইউরোপীয় সেক্যুলার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হওয়ার ফসল। দুর্দিন এখানে শেষ নয়, বাংলা বা বাঙালি সংস্কৃতি নামে ৯২% মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশে কি হচ্ছে এর এক ঝলক এখানে পেশ করা হলো।[৭]

বাঙালি সংস্কৃতিতে নতুন নতুন প্রথার প্রচলন:

নিত্যনতুন প্রথা বা কর্মের প্রচলন বাংলাদেশে বাঙালি সংস্কৃতি নামে অব্যাহতভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে বা নতুনভাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে। মঙ্গল প্রদ্বীপ প্রজনন এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা এর অন্যতম। সংক্ষেপে এর কিছু বর্ণনা পেশ করা হলো:

<u>* মঙ্গল প্রদ্বীপ (ভাগ্যের আলো):</u> এটি মূলত: কিনতল দেবীর আশীর্বাদ নেয়ার একটি হিন্দু নীতি। হিন্দুরা আগুন জ্বালানোর মাধ্যমে তাদের কিছু ধর্মীয় রীতি শুরু করে। বাংলা নাটকের ২০০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রথম এটি চালু হয়। ২০০১ সালে প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান মঙ্গল প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে একটি নাটকের উদ্বোধন করেন। ইতিপূর্বে ১৯৯৬ সালে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলা ১৪০০ সাল উদযাপন কালে মঙ্গল প্রদ্বীপ জানানোর মাধ্যমে তা করেছিলেন।

<u>* মঙ্গল শোভা শিখা চিরন্তন:</u> সেনানিবাসসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এটি সদা চলমান। এটিও অগ্নি উপাসনার আরেকটি ভিন্ন রূপ। ‘র‍্যাগ ডে’ পালন একটি জড়বাদী সংস্কৃতির অংশ হলেও তা এখন বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পালিত হয়ে আসছে। এটি মূলত: হিন্দুদের হোলি খেলার আদলেরই একটি প্রতিবিম্ব। মৃত ব্যক্তির নামে প্রার্থনা করার পরিবর্তে ১ মিনিট নীরবতা পালন, ৩১ ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের উৎসবের অনুকরণে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন, ১লা এপ্রিল এপ্রিল ফুল পালন, ভ্যালেন্টাইন বা ভালোবাসা দিবস পালনসহ অপর ওপর অসংখ্য অনৈসলামী সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতির শ্রদ্ধা আবরণে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটেছে যার ফলাফল নির্ঘাত ইসলাম বর্জনের মহড়া বিশেষ।[৮]

<u>* মঙ্গল শোভাযাত্রা:</u> ১লা বৈশাখ বাংলা সালের প্রথম দিন ঘটা করে পালনের একটা প্রথা দীর্ঘদিনের। হিন্দু-মুসলিম সকলে দিবসটি পালন করে আসছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্র শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে

---

7. AR Mollik, op.cit. P. 45
8. Sarkar, Obaidul Haq. Our Drama, Dhaka, 2003, P. 15
   mangal shobhajatra for removing evil. bd news 24 com.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শাহবাগের মোড় থেকে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রা শুরু হয় সকালে সূর্য উদয়ের সময় থেকে। সর্বোস্তরের জনগণকে এ উৎসবে সমবেদ করায় সেক্যুলার পন্থীদের উদ্দেশ্য এবং বলা যায় তারা এক্ষেত্রে শতভাগ সফল। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই ফুটে ওঠে এ শোভাযাত্রায়। ২০১৬ সালে ইউনেস্কো একে বাঙালি সংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর প্রতিকৃতি সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন বহনকারী শোভাযাত্রার মাধ্যমে অশুভকে প্রতিহত করে শান্তির আগমন কামনায় এ আয়োজন। একে বলা হয়ে থাকে বাংলার চিরাচরিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যদিও উৎসবটি শুরু হয়েছে ১৯৮৯ সালে।[৯] উল্লেখ্য মঙ্গল কামনার জন্য ইসলামের রীতি হচ্ছে সুষ্ঠু ও পবিত্র মন নিয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করা। অথচ মঙ্গল শোভাযাত্রাটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সর্বজনীন সাংস্কৃতির নামে সর্বস্তরের বিশ্বাসী অবিশ্বাসীকে একই কাতারে সামিল করে মূলত: ইসলাম বিচ্যুতি কসরত ছাড়া আর কি হতে পারে এটি!

<u>* ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিবিদদের সংস্কৃতি বুনন ও অনুশীলন:</u> সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সংস্কৃতি মানুষের অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশের বাহক। বিশ্বাসের ভিত্তি যদি হয় তাওহীদ, তাহলে তাওহীদবাদী কর্ম ও আচরণই বেরিয়ে আসবে তার সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে। আর তা যদি হয় তাওহীদের বিপরীত তাহলে তার যোগফল হল ভিন্ন কিছু। এখন দেখা যাক বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদী সংস্কৃতির চর্চার ধরন বিষয়বস্তু এবং পরিধি কি কি:

বাংলারমুখ নামক একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী একথা স্বীকার করেছে যে ধর্মনিরপেক্ষবাদী, সমাজবাদী, কমিউনিস্ট এবং মুসলিমদের সংস্কৃতি এক নয়। মুসলিম নাম বহনকারী এ গোষ্ঠীটি এক গোল টেবিল আলোচনায় বলেছে, জয় বাংলা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামের নির্মূল করা আবশ্যক। জয় বাংলা হচ্ছে সংস্কৃতির বিষয় আর তা লালন পালন করেই ইসলামের মূল উৎপাটন করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের একজন বলেছেন তার বেড়ে ওঠার পাশাপাশি তিনি দুটি কাজ করে যাচ্ছেন, আর তা হলো শুদ্ধ বাংলা শিক্ষা এবং ইসলামের সত্যতা ও বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা। সমাবেশ থেকে আরো বলা হয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম ইসলামের উপস্থিতিতে বাঙালি সংস্কৃতি কখনোই সম্প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।[১০] এসব বক্তব্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ তারা যা বলেছে তা তাদের অন্তরের কথা যা সংস্কৃতি পালনের মাধ্যমে তারা অর্জন করেছে। (চলবে)

---

9. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৮
10. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ জুন ২০০৫, পৃ. ১২

গাজার যুদ্ধের জের

মীযানুল করীম

আবার গাজার যুদ্ধের জের টানতে হচ্ছে। কারণ পৃথিবীতে এখন গাজার যুদ্ধই সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়। গাজায় ইহুদীবাদী ইসরাইলের আগ্রাসন চলছেই। রেহাই পাচ্ছে না নারী, শিশু, বৃদ্ধ এমনকি হাসপাতালের রোগী পর্যন্ত। আর ছাত্র-ছাত্রী তো দূরের কথা। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের বর্বরতার শিকার স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র এমনকি হাসপাতালও। এ পর্যন্ত বহু চিকিৎসক, নার্সসহ অনেক রোগী মারা গেছেন ইসরাইলের হাতে। মাঝখানে খ্যাতি অর্জন করেছে অখ্যাত হামাস বাহিনী। আর কুখ্যাতিই পেয়েছে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী। এখন ইসরাইল ক্রমবর্ধমান চাপ ও ভীতির মধ্যে রয়েছে। গাজার যুদ্ধে ইসরাইলের কি লাভ হয়েছে তারাই ভেবে দেখছে। লাভের ঘরে ফিলিস্তিনিরাই সমৃদ্ধ। ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনীদেরকে নির্মূল করতে চেয়েছিল কিন্তু তা হয়নি। ফিলিস্তিনিদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে কিন্তু তারা শেষ হয়ে যায়নি। তাদের অনেকেই নিহত, আহত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তবুও তারা আন্দোলন এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে বিরত হয়নি, বরং সারা বিশ্বে তাদের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসরাইলের একটি ট্যাংক ধ্বংস করার দাবি করেছে লেবাননের রাজনৈতিক সংগঠন হিজবুল্লাহ। সংগঠনটি জানিয়েছে তারা লেবাননের দখলকৃত কুদস গ্রামের ইফতা ব্যারাকে হামলা চালিয়ে ইসরাইলের একটি ট্যাংক ধ্বংস করেছে। এ সময়ে একজন ক্রু নিহত ও অপর একজন আহত হয়েছে।

তারা আরো জানিয়েছে হিজবুল্লাহ গাজার সমর্থনে স্থানীয় সময় সকল ১০:৪৫ মিনিটে ওই হামলা চালায়। এর আগে উত্তর ইসরাইলের বাইত আল হেলালের দক্ষিণে ৯১ তম ডিভিশন এর ৪০৩ তম আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের অবস্থানেও একটি বিমান হামলার দাবি করেছে দলটি। ওই হামলায় এক সেনা অফিসারসহ দু'জন নিহত হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মা দিবসে ফিলিস্তিনি মায়েদের পক্ষে রাস্তায় শোভাযাত্রা করেছেন নেদারল্যান্ডের নারীরা। ১২ মে রোববার "গণহত্যার বিরুদ্ধে মায়েরা" এই ব্যানারে রাস্তায় মিছিল করেন তারা। মিছিলটি শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু হয়। এ সময় তাদের রক্তাক্ত কাফনে মোড়ানো শিশুর পুতুল বহন করতে দেখা যায়।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় সেখানকার মায়েরা যে নৃশংসতার শিকার হয়েছেন তার প্রতিবাদে ম্যাকডোনাল্ডস, স্টারবাকস এবং বার্গার কিং এর আউটলেট গুলোর সামনে

বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডাচ্ নারীরা। এ সময় তারা রাস্তায় ভুক্তভোগী মায়েদের দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। ইসরাইল বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগানে মুখরিত হতে থাকে বিন্নেনরোট স্কয়ারের (Binnenrotte Square) আকাশ।

গাজায় নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে সেখানে নারীদের হত্যার প্রতিবাদ করে তারা "মা হত্যা বন্ধ কর" শ্লোগান দিতে থাকেন। পদযাত্রার পর গাজার মা ও শিশু হত্যার আবেগঘন বর্ণনা দেন বিক্ষোভকারী নারীরা। পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা ফিলিস্তিনে "মা দিবস" উদযাপনের জন্য মা ও শিশুদের অধিকারের কথা তুলে ধরেন এবং ফিলিস্তিনবাসীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

ফিলিস্তিনীকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হিসেবে দেখতে চায় উত্তর কোরিয়া। রোববার এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফিলিস্তিনের প্রতি এই সমর্থনের কথা জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্য পদ দেয়ার জন্য সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন আছে পিয়ংইয়ংয়ের। উত্তর কোরিয়া প্রত্যাশা করে, অচিরেই জাতিসংঘের ১৯৪তম পূর্ণ সদস্য পদ পাবে ফিলিস্তিন। উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নর্থ কোরিয়ার সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সির খবরে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে ফিলিস্তিনে ইসরাইলকে গণহত্যার মদদ দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এর আগে গত ১৪ এপ্রিল ফিলিস্তিনের ওই প্রস্তাবে ভেটো দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা জানানো হয়। পরে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের ওই প্রস্তাব পাস হয়।

ফিলিস্তিন ২০১২ সাল থেকেই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাচ্ছে কিন্তু তারা পূর্ণ সদস্যের সুযোগ-সুবিধা পায় না। এই সদস্য পদের বিষয়টি শুধু নির্ধারণ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ করতে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দু'টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গাজায় এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর আহ্বান জানিয়ে ইসরাইলকে 'যা কিছু করার' কথা বলেছে ইসরাইলের কট্টর সমর্থক মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। ১২ মে মার্কিন সম্প্রচার মাধ্যম এনবিসির 'মিট দ্যা প্রেস' অনুষ্ঠানে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই আহ্বান জানান তিনি। সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম বলেন, জার্মানি ও জাপানের সাথে লড়াই করে পার্ল হারবারের পর জাতি হিসেবে আমরা যখন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিলাম তখন আমরা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলে যুদ্ধ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। তাই ইসরাইল যেন যুদ্ধ শেষ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় বোমা (পারমাণবিক) দেওয়া উচিত। তারা হারতে পারে না।

গাজার দক্ষিণাঞ্চলের শহর রাফায় ইসরাইলি সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করে অস্ত্র

সরবরাহ রুখে দেয়ায় বাইডেন্ট প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন ইসরাইলের কট্টর সমর্থক লিন্ডসে গ্রাহাম। এ সময় এনবিসির উপস্থাপক ক্রিস্টেন ওয়াকার গ্রাহামের কাছে জানতে চান ১৯৮০ এর দশকে লেবাননে যুদ্ধের সময় ইসরাইলে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত ছিল রোনাল্ড রিগানের প্রশাসন। সেটি ঠিক বলে মানলেও বাইডেন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত কেন ঠিক মনে করছেন না?

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) আদেশ উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনের রাফা শহরে হামলা জোরদার করেছে ইসরাইল। একই সঙ্গে গাজায় পর্যাপ্ত ত্রাণ প্রবেশ নিশ্চিত করতে উপত্যকাটির দক্ষিণে রাফা ক্রসিং খুলে দিতে ইসরাইলকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত ২৫ মে স্থল ও বিমান বাহিনী রাফা শহরে ব্যাপক হামলা চালায়। ২৪ মে আইসিজে রাফায় হামলা অবিলম্বে বন্ধের আদেশ দেওয়ার পর থেকেই সেখানে হামলা চালানো শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী। একই সময়ে ফ্রান্সের প্যারিসে হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

১০ মে ইসরাইলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা একটি আবেদনের উপর শুনানি নিয়ে এমন নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত। এই আবেদন রাফায় ইসরাইলের অভিযান বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে এ আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিল প্রোটিয়ারা। জাতিসংঘের সর্বোচ্চ এই আদালতের আদেশ মেনে চলার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে সদস্য দেশগুলোর। তবে আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এই আদালতে নেই।

আইসিজের আদেশ সত্ত্বেও গত ২৫ মে সকালে গাজা উপত্যকায় ব্যাপক হামলা করে ইসরাইল। ফিলিস্তিনি প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, রাফা ছাড়াও দেইল আল বামাহ শহর, গাজা শহর, জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরসহ ফিলিস্তিনের অন্য এলাকায় হামলা করেছে। ফিলিস্তিনের শরণার্থী নারী উম্মে মোহাম্মদ আল আশকা বলেন, 'এখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমরা আশা করি এই যুদ্ধ শেষ করতে আদালতের সিদ্ধান্ত ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।'

গাজা সিটির বাসিন্দা মোহাম্মদ সালেহ বলেন, 'ইসরাইল এমন একটি রাষ্ট্র যে নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করে। তাই শক্তি প্রয়োগ না করলে ইসরাইলকে থামানো যাবে বলে মনে করি না।'

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কঠোর সমালোচনা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। যুদ্ধের পর গাজার ভবিষ্যৎ সরকারের উপসাগরীয় দেশটির সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে নেতানিয়াহুর মন্তব্যের পর ২৮ মে এর সমালোচনা করলো দেশটি। মধ্যপ্রাচ্যের যে কয়েকটি দেশ ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে সেসবের মধ্যে একটি প্রভাবশালী দেশ আমিরাত। প্রায় সাত মাস ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলে

আগ্রাসন চলমান থাকলেও এ সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে। যদিও তাতে ফাটল ধরছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

নেতানিয়াহুর সমালোচনা করে আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, এ উদ্যোগ নেয়ার জন্য আইনি এখতিয়ার নেই ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর। গাজায় ইসরাইলি উপস্থিতি আড়াল করার কোন পরিকল্পনায় যুক্ত হবে না সংযুক্ত আরব আমিরাত। তিনি বলেছেন, "ফিলিস্তিনি জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এমন একটি ফিলিস্তিনি সরকারকে সহযোগিতায় প্রস্তুত রয়েছে আমিরাত। এর মধ্যে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাও রয়েছে।"

এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, যুদ্ধের পর গাজা পরিচালনার জন্য একটি বেসামরিক সরকারকে আমিরাত, সৌদি আরব ও অপর দেশগুলো সহযোগিতা করতে পারে। নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বলে আসছেন, যুদ্ধের পরও গাজার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসরাইল। ফিলিস্তিনিরা অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এতে সমর্থন রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের।

সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গাজায় সামরিক অভিযানের কারণে নেতানিয়াহুর সাথে আমিরাতের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। আমিরাত কর্মকর্তারা এখন খুব কম তার সাথে কথা বলছেন। আমিরাত যুদ্ধ ও বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে ইসরাইলের সমালোচনা করেছে।

জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদের জন্য ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই সংস্থার সাধারণ পরিষদ। এই ইস্যুতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মতামত প্রকাশের জন্য স্থানীয় সময় শুক্রবার (বাংলাদেশ সময় **১১** মে শনিবার) একটি রেজুলেশন উত্থাপন করা হবে এবং সেটির পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে রাষ্ট্রগুলোকে।

রেজুলেশনটির মূলবিষয়বস্তু হল ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্যপদ প্রদানের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পুনর্বিবেচনার আহ্বান।

জাতিসংঘের মোট সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা **১৯৩**টি। ফিলিস্তিনিদের দাবির প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন রয়েছে কিনা তাও যাচাই করা সম্ভব হবে এই ভোটের মাধ্যমে। কোন রাষ্ট্র যদি জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ চায় সেক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্র অবশ্যই সংস্থাটির সবচেয়ে ক্ষমতাধর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ জোগাড় করতে হবে। এই সুপারিশ নেয়ার পর সাধারণ পরিষদে আবেদন করা হলে আবেদনের উপরে ভোট হবে। সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি আবেদন মঞ্জুরের পক্ষে ভোট দেয় তাহলেই জাতিসংঘের সদস্য পদ পাবে সেই রাষ্ট্র।

জর্দান নদীর পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুসালেম ও গাজা উপত্যকা তিন ভূখণ্ডের সমন্বয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। তবে **১৯৬৭** সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধে জয়ী হয়ে এই তিন ভূখণ্ডই দখল করে ইসরাইল। পরে **১৯৯৩** সালের সেপ্টেম্বরে আসলো চুক্তিতে ফিলিস্তিনকে নিজস্ব প্রশাসন ও সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রের সম্মান দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে যাতে তারা রাষ্ট্রের সম্মান পেতে পারে সেই রাস্তা তৈরি করে রাখা হয়েছিল। তারপর থেকেই জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ফিলিস্তিন। সেসব চেষ্টার ধারাবাহিকতায় **২০১১** সালে 'পর্যবেক্ষক' হিসেবে জাতিসংঘে প্রবেশের অনুমতি পায় ফিলিস্তিন।

গত ৭ অক্টোবর জানা যায়, ইসরাইলি বাহিনীর আগ্রাসন শুরুর পর ফের পূর্ণ সদস্য পদের জন্য তৎপর শুরু করে ফিলিস্তিন। নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে আবেদনও করেছিল জাতিসংঘের ফিলিস্তিন প্রতিনিধিদল। তবে **১৮** এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে বাতিল হয় সেই আবেদন। নিরাপত্তা পরিষদকে সেই সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনার আহ্বান জানাতেই **১১** মে ভোট হয়েছে সাধারণ পরিষদে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘ মিশনের এক সদস্য রয়েটার্সকে বলেন, আমরা শুরু থেকেই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে এবং আমরা বিশ্বাস করি মধ্যপ্রাচ্য স্থিতিশীলতার জন্য স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের গঠন প্রয়োজন।

ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের নেতাদের সংলাপ ও মতামতের ভিত্তিতেই স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখানে জাতিসংঘ দপ্তরে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা **১৮** এপ্রিলের প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিলাম। ভোটাভুটি সফল হলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে ফিলিস্তিন। কূটনীতিকরা বলেছেন খসড়া প্রস্তাবটি এবার পাস হওয়ার জন্য সমর্থন পেতে পারে। **১৯৩** সদস্যের সাধারণ পরিষদে এই ভোট ফিলিস্তিনিদের সমর্থনের বৈশ্বিক সমীক্ষা। জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য একটি আবেদন প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ ও পরে সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হতে হয়।

সাধারণ পরিষদ একা জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদের অনুমোদন দিতে পারেনা। খসড়া প্রস্তাবটিতে ভোট হওয়ার পর ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কিছু অতিরিক্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে ফিলিস্তিন। যেমন সাধারণ পরিষদের এসেম্বলি হলে জাতিসংঘের অন্য সদস্যদের মতো একটি আসন পাবে। তবে ভোট প্রয়োগের কোনো ক্ষমতা তাদের থাকবে না। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইল হামাস যুদ্ধের আট মাস পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন বিস্তৃত করে চলছে ইসরাইল বলে মনে করে জাতিসংঘ।

যুদ্ধ বিরতির জন্য ইসরাইলের সাথে আর কোন আপোস না করার ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সাত মাস ধরে চলা ইসরাইলের আগ্রাসন থামানোর লক্ষ্যে কায়রোতে তখনও আলোচনা চলছে। রাফায় হামলা করলে ইসরাইলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এতে ক্ষুব্ধ

ইসরাইল। গাজা ভূখণ্ডে অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। এই অবস্থায় গাজা যুদ্ধবন্ধে বাড়ছে বৈশ্বিক চাপ। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের সায় দিয়েছিলো। তবে ইসরাইল বেঁকে বসায় যুদ্ধ বিরতি হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। এ অবস্থায় যুদ্ধ বিরতির জন্য ইসরাইলের সাথে আর আপোস না করার ঘোষণা দিয়েছে হামাস।

ইসরায়েলের আগ্রাসন থামানোর লক্ষ্যে কায়রোতে এখনো আলোচনা চলছে। ইসরাইল দক্ষিণ গাজার রাফা শহরে ট্যাংক ও বিমান হামলা চালিয়েছে এবং শহরটিতে বড় হামলার হুমকি দিয়েছে।

ইসরাইলি বাহিনী মিশরের সাথে রাফা সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে প্রবেশ করেছে। এটি গাজায় সহায়তা সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ এবং আহত রোগীদের সরিয়ে নেয়ার জন্যও এটি একমাত্র পথ। ইসরাইল সেটি বন্ধ করে দিয়েছে। হামাস এর আগে মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে আসা গাজা যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাবের সম্মত হয়। এরপর পরপরই ইসরাইল জানায় এই প্রস্তাবের শর্তগুলো দাবি পূরণ করেনি এবং চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার পাশাপাশি রাফাতে হামলার ঘোষণা দেয়।

ইসরাইলি বাহিনী গাজার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত রাফাতে আকাশ ও স্থল থেকে আক্রমণ চালায় এবং শহরের কিছু অংশ ছেড়ে যাওয়া নির্দেশ দেয়। মূলত গাজার শহরটি এখন ১৪ লাখেরও বেশি বাস্তচ্যুত ফিলিস্তিনীর আশ্রয়স্থল। রয়টার্স বলছে কাতারে হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সদস্য ইজ্জত আল রেশিক মধ্যরাতে বিবৃতি দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের বাইরে যাবে না। ওই চুক্তির ফলে গাজায় কিছু ইসরাইলি বন্দীর পাশাপাশি ইসরাইলে আটক ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের মুক্তি দেয়া হবে। রেশিক বলেছেন, ইসরাইল কোন ধরনের চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে আন্তরিক নয় এবং তারা রাফা আক্রমণ ও ক্রসিং দখল করার জন্য যুদ্ধ বিরতির আলোচনাকে একটি আবরণ হিসাবে ব্যবহার করছে। অবশ্য ইসরাইলের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে একজন ইসরাইলী কর্মকর্তা বলেন হামাস যে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে তা মিশরীয় প্রস্তাবের চেয়ে খুবই দুর্বল এবং এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা ইসরাইল গ্রহণ করতে পারে না।

কায়রোতে হামাস, ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতারের প্রতিনিধি দল বৈঠক করছেন। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মিশরের অধিভুক্ত টিভি বলেছে কায়রোতে এই আলোচনা হয়েছে এবং রাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে হামাস তার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সংশোধন করেছে এবং সংশোধন আলোচনায় সৃষ্ট অচল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে। হামাসের সর্বশেষ বিবৃতির মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ওয়াশিংটন দাবি করে দুই পক্ষ খুব বেশি দূরে নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন আমরা বিশ্বাস করি চুক্তির সুযোগ রয়েছে। দুই পক্ষই কাছাকাছি রয়েছে এবং চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য যা করা প্রয়োজন তা করা উচিত।

রাফায় হামলা করলে ইসরাইলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ইসরাইলের জন্য নির্ধারিত বোমার চালান আটকে দিয়েছে ওয়াশিংটন। বাইডেন বলেছেন ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া বোমাগুলো ব্যবহার করেছে ইসরাইল। ইসরাইলের দাবি রাফাতে লুকিয়ে থাকা হাজার হাজার হামাস যোদ্ধাকে পরাস্ত করতে অবশ্যই সেখানে হামলা করতে হবে। এ শহরটি লাখ লাখ ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়স্থল। তারা ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে উত্তরাঞ্চল থেকে রাফা শহরে পালিয়ে এসেছে।

রাফা নগরীতে ইসরাইলকে বড় কোন অভিযান না চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সতর্ক করার পরও ভারী গুলাবর্ষণ শুরু করেছে ইসরাইল। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএকে দেয়া সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন ইসরাইল যদি রাফায় বড় অভিযান চালায় তাহলে তিনি ইসরাইলকে মার্কিন অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেবেন। জাতিসংঘে ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত এটাকে খুবই 'হতাশা জনক বক্তব্য' বলে মন্তব্য করেছেন।

গাজার আল শিফা হাসপাতালে মিলেছে তৃতীয় গণ কবরের সন্ধান। এই গণকবর থেকে এখন পর্যন্ত ৪৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু। আনাদোলুর খবরে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় কমপক্ষে সাতটি গণকবর পাওয়া গেছে। সাত মাসের ও বেশি সময় ধরে ইসরাইল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটিতে নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

ফিলিস্তিনের গাজার বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে ইসরাইলকে বিস্তারিত তথ্য দিতে অঞ্চলটির আকাশে অন্তত ২০০ গোয়েন্দা নজরদারি মিশন চালিয়েছে বৃটেনের এয়ার ফোর্স। ১০০০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে নজরদারি চালিয়েছে বিমানগুলো। সাত অক্টোবর গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নজরদারি চালিয়েছে ব্রিটিশ এয়ার ফোর্স। এক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্স নজরদারি বিমান শ্যাডো আর-১ ব্যবহার করে এই নজরদারি চালিয়েছে। এই বিমানগুলো রয়েল এয়ারপোর্টসের ১৪ নম্বর স্কোয়াড্রেন পরিচালনা করে। হামাসের হাতে ব্রিটিশবন্দী থাকার পরও ইসরাইল গাজায় যে হত্যা চালাচ্ছে সে বিষয়ে ব্রিটিশের সমর্থন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নানা বিতর্ক থাকার পরও ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে নজরদারির আওতা বাড়িয়েছে এবং গাজায় নজরদারির বিষয়ে বারবার জানতে চাওয়ার পরও বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। ■

১০.০৬.২৪

প্রশ্ন-১ ঃ আমরা জানি জুমু'আর দিন সপ্তাহের ফযীলতপূর্ণ দিন এবং জুমু'আর রাতও একটি ফযীলতপূর্ণ রাত। সেই কারণে অনেকে জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করেন এবং জুমু'আর রাত জাগরণ করে ইবাদাত বন্দেগী করেন। এ ব্যাপারে সঠিক কথা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আজিজুল হক, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীছে এসেছে:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنَ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাতগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র জুমু'আর রাতকে জাগরণের (নৈশ ইবাদাতের) জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা, আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা। তবে যদি তোমাদের কারো অভ্যাসগত নফল সিয়াম পালনের দিন হয়। (যেমনঃ আইয়্যামে বীযের সিয়াম। তাহলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ সে ঐ দিন (নফল) সিয়াম রাখতে পারবে।) (সহীহ মুসলিম, অধ্যায় সিয়াম, অনুচ্ছেদ : ১৮, হাদীস নং-২৫৫০)

এ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র জুমু'আর দিন নফল সিয়াম রাখা এবং কেবল জুমু'আর রাত জাগরণ করে 'ইবাদাত-বন্দেগী করা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

اِلَّا أَن يَصُومَ قَبْلَهُ أَو يَصُومَ بَعْدَهُ

অবশ্য কেউ যদি জুমু'আর দিনের আগের দিন অথবা পরের দিন সিয়াম পালন করে তাহলে সে জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করতে পারে। (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং-২৫৪৯)

রাত জেগে 'ইবাদাত করার বিধানও সিয়াম পালন করার মতই।

প্রশ্ন-২ ঃ বাংলাদেশী জনৈক নারী তাওয়াফে ইফাযা করেননি। ইতোমধ্যে তিনি ঋতুমতী হয়ে পড়েন। হজ্জ কাফেলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তার জন্য কাফেলার বিলম্ব করা সম্ভব নয়। পবিত্র হয়ে তাওয়াফে ইফাযা করা পর্যন্ত সৌদি আরবে অবস্থান করাও তার একার পক্ষে সম্ভব নয় এবং দেশে গিয়ে পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফে ইফাযা করার জন্য আবার মক্কায় আসাও তার পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায়তার করণীয় কি?

সালমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ তাওয়াফে ইফাযা বলা হয় হজ্জের মূল তাওয়াফকে। এ তাওয়াফ না করলে হজ্জই সম্পন্ন হয়না। আর হজ্জের এ তাওয়াফ না করেই জনৈক নারী ঋতুমতী হয়ে গেছেন। পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় অবস্থান করা অথবা দেশে গিয়ে পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় মক্কায় এসে তাওয়াফ করা যদি উক্ত নারীর জন্য অসম্ভব হয়, তাহলে তিনি নিম্নের

দু'টি পন্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন :

এক. তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা নিয়ে ঋতু বন্ধ করা গেলে বা ঋতু আসার আগে চিকিৎসা নিয়ে ঋতু বিলম্বিত করা গেলে সেটা করা যেতে পারে। আর যে সকল মহিলা 'উমরায় যাবেন তারা মাসিকের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ যখন সুস্থ বা মাসিকমুক্ত থাকবেন, তখন 'উমরায় যাওয়ার সময় নির্ধারণ করতে পারেন।

দুই. লজ্জাস্থানে প্যাড বা কাপড় এমন ভাবে বেঁধে নিতে হবে যাতে মাসজিদে বা মাতাফে (তাওয়াফ করার জায়গায়) রক্ত না পড়ে। অত:পর তাওয়াফ করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) পছন্দ করেছেন। (ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৮৫)

প্রশ্ন-৩ঃ আমরা সারা দুনিয়ার মুসলিমগণ প্রতিদিন ইসলামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি পবিত্র কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে। প্রতিবছর সারা দুনিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম কা'বা তাওয়াফ এবং কা'বা কেন্দ্রিক হাজ ও 'উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশি মুসলিমগণ সেই মহা পবিত্র কা'বা সম্পর্কে জানি খুব কম। এমনকি জানিনা এ কথাই সঠিক। দয়া করে 'মাসিক পৃথিবী' পত্রিকার মাধ্যমে পবিত্র কা'বার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা ইতিহাস জানিয়ে দিলে আমরা এবং আমার মত আরও অনেকেই জেনে ধন্য হবে।

আব্দুল আলীম, রানীবাজার, রাজশাহী।

উত্তর ঃ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোন মানুষ ছিল না, ছিলনা কোন ঘর বাড়ি। এমনই এক সময় আল্লাহর 'ইবাদত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ মক্কা মোকাররমায় কা'বাঘর নির্মাণ করেন এবং কা'বাকে কেন্দ্র করে তারা আল্লাহর 'ইবাদত বন্দেগী করতে থাকেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে কা'বাকে মানুষের সালাতের কিবলা বা কেন্দ্র বানিয়ে মানবজাতিকে কা'বা কেন্দ্রিক 'ইবাদত বন্দেগী করার নির্দেশ দেন। তাই সারা বিশ্বের মুসলিমগণ কা'বার দিকে মুখ করে বা কা'বাকে কিবলা বানিয়ে ইসলামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত আদায় করে থাকেন এবং প্রতিবছর কা'বাকে কেন্দ্র করে হাজ ও 'উমরা পালন করেন। সর্বোপরি কা'বা হল সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মার কেন্দ্র ও কিবলা। কা'বার সাথে রয়েছে মুসলিম উম্মাহর প্রাণের সম্পর্ক।

পবিত্র কা'বা ঘরের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

পবিত্র কা'বা ঘরের উত্তর-পূর্ব সম্মুখভাগের দেয়াল (যেখানে এর প্রবেশদ্বার রয়েছে) এবং এর বিপরীত দিকের দেয়াল (পশ্চাৎ ভাগের) এই দেয়াল দুইটির ৪০ ফুট করে লম্বা। অপর দেয়াল দুইটি ৩৫ ফুট করে লম্বা এবং এ দেয়াল দুইটির উচ্চতা ৫০ ফুট। এর

উত্তর-পশ্চিম দিক কিঞ্চিত ঢালু ছাদ বিশিষ্ট যেখান দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। একে মিযাব (ميزاب) বলা হয়।

মক্কার চতুর্দিকের পাহাড়ে প্রাপ্ত লালিমা মিশ্রিত কালো রংয়ের (ধুসর বর্ণ) পাথর স্তরে স্তরে সজ্জিত করে পবিত্র কা'বাঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে মর্মর পাথর দ্বারা।

পবিত্র কা'বা ঘরের উত্তর কোণকে 'আর রুকনুল ইরাকি', পশ্চিম কোণকে 'আর রুকনুশ শামি', দক্ষিণ কোণকে 'আর রুকনুল ইয়ামানি' এবং পূর্ব দিকের কোণকে আল হাজরুল আসওয়াদ এর নাম অনুসারে 'আর রুকনুল আসওয়াদ' বলে।

সারা দুনিয়ার মুসলিম তথা মুসলিম উম্মাহর কাছে মহান ও পবিত্র ঘরটি কা'বা নামে বিশেষভাবে পরিচিত। অবশ্য এর আরো কয়েকটি নাম আছে। যেমন:

(ক) بَيْتُ الْحَرَم (বাইতুল হারাম) অর্থাৎ সম্মানিত ঘর।

(খ) بَكَّة (বাক্কা) এর অর্থ হল ভেঙে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি। কা'বা ঘরকে বাক্কা এজন্য বলা হয় যে, কা'বা বিদ্রোহীদের দর্পকে খর্ব করে। তাই কা'বা এ নামে অভিহিত।

(গ) بَيْتُ الْعَتِيق (বাইতুল আতিক) মুক্ত, প্রাচীন, মর্যাদাপ্রাপ্ত ঘর। এই পবিত্র ঘরটি সকল বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল বলে এই নামকরণ করা হয়েছে।

আবার চারটি দেয়াল একটি কৃষ্ণ বর্ণ গিলাফ দ্বারা আবৃত থাকে যা ভূমি পর্যন্ত ঝুলে থাকে এবং ভিত্তির সাথে সংলগ্ন তামার আংটা দ্বারা আটকানো থাকে।

পবিত্র কা'বা নির্মাণকারিগণের তালিকা:

ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে কা'বা নির্মাণ কারিগণের সংখ্যা **১১** জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন:

প্রথম: ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে মক্কা মুকাররামায় কা'বা নির্মাণ করেন।

দ্বিতীয়: কা'বা নির্মাণকারী হলেন মানবজাতির আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম।

তৃতীয়: নির্মাণকারী হলেন শীষ আলাইহিস সালাম।

চতুর্থ: নির্মাণকারী হলেন মুসলিম উম্মাহর পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালাম এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর কা'বার দেয়াল তৈরি করেন। আদম আলাইহিস সালাম এর সময় ফেরেশতারা হেরা পাহাড় থেকে পাথর এনে দিতেন। আর আদম আলাইহিস সালাম সেই পাথর দিয়ে কা'বার ভিত্তি স্থাপন ও কা'বা নির্মাণ করেন।

পঞ্চম: নির্মাণকারী আমালিকা সম্প্রদায়।

ষষ্ঠ: জুরহাম গোত্র।

সপ্তম: কুসাই বিন কিলাব।

অষ্টম: কুরাইশ।

নবম: আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ির (রা)

দশম: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

একাদশ: সুলতান মুরাদ।

ঐতিহাসিকগণ কা'বা নির্মাণকারিগণের সংখ্যার ব্যাপারে পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। তবে তিনজন পুনঃনির্মাণকারীর ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তারা হলেন-

এক: ইবরাহিম আলাইহিস সালাম।

দুই: কুরাইশ

তিন: আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ির (রা)

অবশ্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফও পরে কা'বাকে ভেঙে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন (মক্কা মুকাররমার ইতিকথা, পৃ. ১৯৭)

প্রশ্ন-৪ ঃ মসজিদুল হারাম এর বিবরণ জানতে চাই

জাকির হোসেন, মনিরামপুর, যশোর।

উত্তর ঃ পবিত্র কা'বা ও তার চারদিকে অবস্থিত মাতাফ এর চারদিকে বর্তমান পাঁচ তলা বিশিষ্ট যে মসজিদটি রয়েছে সেই পবিত্র মাসজিদটিকেই মসজিদুল হারাম বলা হয়।

যমযম কূপ :

যমযম কূপ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি নিদর্শন। (সহীহ আল বুখারীর ৩৩৬৪-৬৫ নং হাদিস থেকে যমযম কূপের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)

ইবরাহিম (আ) তার স্ত্রী (হাজার) ও শিশু পুত্র ইসমাইল (আ)কে নিয়ে আসেন এবং তাদের দু'জনকে বাইতুল্লাহর নিকটে মাসজিদের সন্নিহিত উঁচু অংশে যমযম কূপের উপর অবস্থিত একটি বিশাল গাছের নিচে, সাথে কিছু খেজুর ও মসকে কিছু পানিসহ রেখে যান। তখন মক্কায় কোন মানুষ ছিল না এবং সেখানে কোন পানিও ছিল না। খেজুর ও পানি শেষ হয়ে গেলে একপর্যায়ে হাজার (আ) এর বুকের দুধও শুকিয়ে যায়। শিশু পুত্র ইসমাইল (আ) ক্ষুধা ও পিপাসায় ছটফট করছিলেন। অনতি দূরে ছিল সাফা ও মারওয়া পাহাড়। মা হাজার (আ) জনমানুষের সন্ধানে প্রথমে সাফা পাহাড়ে উঠলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোন মানুষের সন্ধান নেই। সাফা থেকে নেমে দৌঁড়িয়ে উপত্যকা পেরিয়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে- না কোন মানুষের সন্ধান নেই। এভাবে একবার দু'বার নয় সাতবার। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং (বর্তমান) যমযমের নিকটে একজন ফেরেশতা দেখলেন। সেই ফেরেশতা তার পায়ের গোড়ালি কিংবা পাখা দ্বারা মাটিতে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি উপচে উঠতে লাগলো। মা হাজার (আ) সেটাকে হাউজের রূপ দিলেন। এই হলো যমযম কূপের পরিচিতি ও ইতিহাস।

যমযম কূপের অবস্থান:

বানু শায়বার দরজার নিকটে কা'বার প্রবেশদ্বারের বামে হাজরে আসওয়াদের ঠিক বিপরীত

দিকে যে গম্বুজটি রয়েছে তার অভ্যন্তরেই যমযম কূপটি অবস্থিত। কামরার ভিতরে ভূমির মেঝের উপর যে কূপটি অবস্থিত তার সবকিছুই শান বাঁধানো। বর্তমানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তা থেকে পানি উত্তোলনের ও বিভিন্ন স্থানে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাসজিদুল হারাম বা কা'বা ঘরের বিবরণ:

পবিত্র কা'বা ঘর বিশ্ব মুসলিমের কিবলা ও পবিত্রতম স্থান। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম 'ইবাদতের ঘর বা আল্লাহর ঘর। সমগ্র দুনিয়ার মুসলিমগণ এই ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন এবং প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মুসলিম এই ঘরের তাওয়াফ এবং হাজ ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে এই ঘরে আগমন করেন। (দেখুন ইসলামী বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)

পবিত্র কা'বা ঘরের প্রতিটি অংশ এমনকি প্রতিটি বালু কণাও পবিত্র ও মহা মর্যাদাপূর্ণ।

হাজরে আসওয়াদ:

আল হাজারুল আসওয়াদ বা কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ জান্নাতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি। সহীহ ইবনে খুজাইমায়ে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

হাজরে আসওয়াদ জান্নাতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি। তিরমিযীতে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ জান্নাতের পাথর হওয়া সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

কা'বা নির্মাণের সময় ইবরাহিম (আ) এ পাথরটি কা'বার পূর্ব কোণে লাগান। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের পূর্বে কুরাইশরা যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করে তখনও তিনি নিজ হাতে কা'বার দেয়ালে হাজরে আসওয়াদটি লাগিয়ে কুরাইশদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আল্লাহ জাহিলিয়াতের অপবিত্রতা ও নাপাকি এবং জালিম পাপিষ্ঠদের হাতের কালিমায় হাজরে আসওয়াদ এর রং পরিবর্তন না করতেন তাহলে প্রথম দিন একে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন (দুধের/বরফের মত সাদা ধবধবে) হুবহু সে আকৃতিতেই পাওয়া যেতো। (মক্কা মুকাররমার ইতিকথা, পৃ. ২১৩-১৪)

হাজরে আসওয়াদ কা'বার দক্ষিণপূর্বকোণে অবস্থিত। এই পাথরটি বহু মূল্যবান ও বরকতময় পাথর। এই পাথরটি একটি জান্নাতি পাথর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাথরটিকে চুমু দিয়েছেন। এই পাথরটি চুমু দেয়ার ফজিলত অনেক বেশি। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২)

হাজরে আসওয়াদ এর অবস্থান:

হাজরে আসওয়াদ কা'বার দক্ষিণ পূর্ব কোণে মাতাফ থেকে দেড়মিটার উপরে অবস্থিত। (মক্কা মুকারামার ইতিকথা, পৃষ্ঠা-২১৮)

মাকামে ইবরাহিম ও হাতিম:

কুরআন মাজীদে মাকামে ইবরাহিম বলতে সেই ঐতিহাসিক পাথরটিকে বোঝানো হয়েছে যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম (আ) কা'বা নির্মাণ করেছেন। তিনি যখন উপরে উঠতেন পাথরটিও আল্লাহর হুকুমে উপরে উঠতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ করো।" (২: সূরা আল বাকারা, ১২৫)

জামি আত তিরমিযীতে 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

"নিশ্চয়ই হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহিম জান্নাতের দু'টি ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি পাথরের নূর মিটিয়ে দিয়েছেন। নূর না মিটালে এগুলোর আলোতে পূর্ব থেকে পশ্চিম ভূখণ্ড পর্যন্ত আলোক উজ্জ্বল হয়ে যেত।"

(কা'বা নির্মাণের সময়) জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহিমকে (জান্নাত থেকে) নিয়ে এসে ইবরাহিম (আ) এর পায়ের নিচে রেখে দেন। (মক্কা মুকাররামার ইতিকথা, পৃষ্ঠা ৩২০)

এর উপর দাঁড়িয়ে তিনি কা'বা নির্মাণ করেন। আর ইসমা'ঈল (আ) তাঁকে নির্মাণ কাজের যোগান দিতেন। এই পাথরে ইবরাহিম (আ) এর পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান।

পবিত্র কা'বা ঘরের উত্তর-পূর্ব দেয়ালের বিপরীত দিকে মাতাফের প্রবেশ দ্বারে কাছে ঘেরা ক্ষুদ্র গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ঘর আছে যার মধ্যে সেই পাথর (মাকামে ইবরাহিম) সংরক্ষিত রয়েছে। এটি জান্নাতের একটি পাথর। এটি আবার জান্নাতে ফিরে যাবে।

হাতীম:

কা'বা সংলগ্ন উত্তর পাশের দেড়মিটার উঁচু অর্ধ বৃত্তাকার দেয়াল ঘেরা স্থানের নাম হাতীম। এটিকে হিজরে ইসমা'ঈলও বলা হয়। ইবরাহিম (আ) নির্মিত কা'বার কিয়দাংশ কুরাইশদের পুণর্নির্মাণকালে অর্থের অভাবে বাদ থেকে যায়। তখন উক্ত অংশটি পৃথক প্রাচীর দ্বারা ঘিরে রাখা হয়, এটিই হাতীম।

আল মুস্তাজার:

রুকনে ইয়ামানী থেকে কা'বার দরজার পেছনে বিলুপ্ত দরজা পর্যন্ত চার হাত জায়গাকে আল মুস্তাজার বা গুনাহ মুক্তির জায়গা বলা হয়।

মুলতাযাম:

মুলতাজাম হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালের স্থানটুকুর নাম। এর অপর নাম হচ্ছে اَلْمُدَّعَا (দু'আর জায়গা) মুলতাজাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আঁকড়ে ধরার স্থান। লোকেরা এটাকে ধরে দু'আ করে বলে এর নাম হচ্ছে মুলতাজাম। এর ফযীলত

অনেক বেশি। যে সকল জায়গায় দু'আ কবুল হয় এটি তার অন্যতম। (মক্কা মুকাররমার ইতিকথা, পৃ. ২৩৬)

হিজরে ইসমা'ঈল:

কা'বা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের দেড়মিটার উঁচু অর্ধবৃত্ত দেয়ালের ভিতরের গোলাকার স্থানকে হিজরে ইসমা'ঈল বা ইসমা'ঈল কর্ণার বলা হয়। এটাকে হাতিমও বলা হয়।

মাতাফ:

মাতাফ আরবি শব্দ। এর অর্থ হল তাওয়াফ করার স্থান। পবিত্র কা'বা ঘরের চারদিকে মাসজিদুল হারাম বা হারাম থেকে নিচু ও খালি যে চত্তরটিতে তাওয়াফ করা হয় তার নামই মাতাফ। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত
বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
২	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৩৮২০/-
৩	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২২০০/-
৪	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
৫	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২১৬০/-
৬	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১২০০/-
৭	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪০০/-
৮	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২১৩০/-
৯	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
১০	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
১১	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	১৮০/-
১২	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
১৩	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
১৪	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.bicdhaka.com